বিয়ারে লম্বা এক চুমুক দিয়ে বুড়ো ফার্ণান্দেজ শুরু করলো 'গভীর রাত পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরে না এণ্টনি। শুধু আজই নয়। তিনশ পয়ষট্টি দিনের বেশীর ভাগ রাতই তাই। সারাদিন মাছ ধরার বোটে করে সমুদ্রে কাটিয়ে পারে এসে ভিরলেই এণ্টনি একেবারে অন্য মানুষ। কতোবার গিয়েছি ওর সঙ্গে মাছ ধরতে। যতোক্ষণ কাজ ততক্ষণ ওর মেজাজ ভালো। কাজ শেষ হলেই মাছের জালটি গুটিয়ে রেখে সোজা ঢুকে পরে ও পাশের শরাবখানায়'। এক চুমুকে বাকি বিয়ারটা শেষ করে ফার্ণান্দেজ কাউন্টারে এগিয়ে গেলো মগটা আবার ভরতি করে আনবার জন্য। মগটা টেবিলে রেখে আরাম করে বসে ফার্ণান্দেজ বললো 'আরে, সে মেয়েটাতো ওখানেই কাজ করে'! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফার্ণান্দেজ বুঝতে পারলো মেয়েটাকে আমার চেনার কোন কারণ নেই।

চোখের ইঙ্গিতে অবাক হবার ভাব প্রকাশ করে বুড়ো বলল 'হার বেরোনো সেই মেয়েটা! ছিপছিপে গড়ন! কি যেন নাম ছাই' মনেও করতে পারছি না। দেখলে মনে হবে মুখে রক্ত নেই। অথচ চোখ দুটো প্রখর। সবসময়ই জ্বলছে'।

বুঝতে না পারলেও মেয়েটির বর্ণনায় খানিকটা আন্দাজ করে নিলুম। ফার্ণান্দেজের চোখ থেকে চোখ সরাতে ও হয়তো ধরে নিলো এবার আমি বুঝে নিয়েছি। 'সন্ধ্যে থেকে শরাবখানায় কাজ করে, আর থেকে থেকে বিয়ারের মগে চুমুক মেরে এর তার সঙ্গে ঢলাঢলি করে'।

ফার্ণান্দেজ আমাকে উৎসাহি শ্রোতা পেয়ে তখন আরো খানিকটা এগিয়েছে।

'এণ্টনি রোজ সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হবে ওখানে। ময়দা কলে

চাকরী করে মার্থা! ঐ মার্থাই এসে খবরটা দিয়েছিল এণ্টনীর বৌ কে'।

কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছি ফার্ণান্দেজের দিকে।

জেনোয়া বন্দরে এই প্রথম এসেছি। ফার্ণান্দেজকে বলেছিলাম 'কিছুই জানিনা এখানকার। কটা দিন আছি। ঘুরে দেখছি শহরটা'।

গল্প করতে করতে কখন আপন করে নিয়েছে বুড়ো। ও ধরে নিচ্ছে সবই আমার চেনা।

ফার্ণান্দেজ আরো খানিকটা বিয়ার গলায় ঢেলে নিয়ে বললো 'মার্থা এসে জানিয়েছিলো, এণ্টনি নাকি ও মেয়েটার কোমর ধরে শহরের বাইরে কোথায় যাচ্ছিল। শুনে দুঃখ করেনি। রাগও করেনি ওর বৌ রোজেলিনি।

একটু দম নিয়ে এণ্টনি বললো 'রাগ করেছিল এণ্টনি'।

মুখ দিয়ে ফস্কে বেরিয়ে গেলো 'কেনো'?

অবহেলার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ফার্ণান্দেজ বললো 'বছর দুই আগেকার কথা। নভেম্বর মাসের একটা দিন। বিকেল না হতেই এণ্টনি হঠাৎ বাড়ী ফিরে এসেছিল। বোধহয় মাছ ধরতে আর ভালো লাগছিল না। মনটা টানছিলো বাড়ী যাবার জন্য। সমুদ্রে প্রচণ্ড ঢেউ সেদিন। এতো ঠাণ্ডা যে জামা কাপড়ে মানাচ্ছিলোনা।

এণ্টনি ডিঙ্গি বোটটাকে পারের কাছে বেঁধে কয়েক কাপ কালো কফি খেলো। মনটা ততক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে ছিলো বিকেলটা রোজেলিনির সঙ্গে কাটাবে। মাছ ধরার জালটা নাবিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে চোখে পড়েছিল রোজেলিনি আর পাকোকে। ওরই বিছানায় শুয়ে আছে।

রোজেলিনিও ভাবতে পারেনি এণ্টনি হঠাৎ এ সময়ে ফিরে আসবে। হকচকিয়ে গেলেও, দুজনেই একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করে দিলো। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে পাকো ট্রাউজারটা কোনক্রমে পায়ে গলিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো।

অসীম আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি ফার্ণান্দেজের দিকে। এতোগুলো কথা বলে ফার্ণান্দেজ জিরিয়ে নিচ্ছে।

দূর থেকে জাহাজ বন্দরটা বেশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। জাহাজ ঘাটে লোকজন নেই। জাহাজে ওঠার জন্য আর কেউ ভীড় করে নেই।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সমুদ্রের পশ্চিম কোল থেকে একটা লালচে আভা এসে জলের ওপর যেনো একরাশ ফাগ ছরিয়ে দিয়েছে। জুলাই মাসের সূর্য অস্ত যাই যাই করেও খানিকটা গল্প করবার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে চায়। রাস্তা ঘাটেও মানুষ চলাচল কমে এসেছে। কাজকর্ম সেরে এবারে আড্ডা জমাবার পালা। কফিখানাগুলো লোকজনের ভীড়ে গম গম করছে। আবার কেউ বসেছে বিয়ার নিয়ে।

জাহাজ বন্দর পেরিয়ে শহরের আস্তানার কাছে রেষ্টুরেন্টে বসে বিয়ার খাচ্ছিলাম। বিদেশী লোক দেখে কাছে এসে আলাপ করলো বুড়ো ফার্ণান্দেজ।

ততক্ষণে বেশ কয়েকজন এসে জড়ো হয়েছে রেষ্টুরেন্টটায়। পুরুষরা এসেছে কাজকর্ম সেরে।

মেয়েরা ফিরছে দোকান বাজার শেষ করে।

ইওরোপে আমার প্রথম দিনটা শেষ হয়ে এলো।

জেনোয়া ইটালির জাহাজ বন্দর। ইটালির জাহাজ বন্দর ইউরোপগামি পুবের জাহাজ যাত্রীদের প্রথন মাটির ছোঁয়া। মধ্য-প্রাচ্য আর আফ্রিকার মাথা পেরিয়ে কল্পনার ইওরোপের সঙ্গে বাস্তব ইওরোপের প্রথম যোগাযোগ। সকাল বেলার ভেজা মাটিতে প্রথম পা রাখলে রক্তের মধ্যে আপনা থেকেই একটা পুলক বয়ে যায়। বিস্ময় নাড়া দেয়।

আমার ইটালি বাসের মেয়াদ মাত্র দিন কয়েকের জন্য। শুধু আমি কেন! জাহাজ যাত্রীদের নিতান্তই কোন গোলযোগে না পরলে ইটালির জাহাজ বন্দরে কেউ বেশীক্ষণ আটকে থাকে না। সমস্ত ইওরোপের সঙ্গে ট্রেনের যোগাযোগ এখান থেকেই শুরু হয়।

তাই অনেক জাহাজ যাত্রী হয়তে ট্রেন না ধরতে পারলে মাঝে মাঝে কয়েকটা ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে যান। আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তখন ঠাঁই খুজছি। জাহাজে ছিলো চলোমান ঠাঁই। আর ইটালি হলো চলার পথে ক্ষনেক দাঁড়াবার ঠাঁই। ভালো লেগে গেলো ইটালিকে। ভাবলাম দিন কয়েক কাটিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

জাহাজ যাত্রীদের মধ্যে ইটালি সম্পর্কে খুব বেশী লোককে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি। অবশ্য যে দুয়েকজন ইটালির উদ্দেশ্যে এসেছেন তাদের কথা আলাদা। জাহাজে করে ভারত থেকে ইটালিতে আসার লোক সত্যিই চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। কেষ্টবিষ্টু লোক, যারা ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে আসেন তাদের হাতে অতো সময় কোথায়? জাহাজের গদাই লস্করি চালের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার মতো মেজাজও নেই। তাই জাহাজ যাত্রীরা ইটালির বন্দরে ক্ষণেকের অতিথি। যে যার কাজে চলে গেছে।

জাহাজ ঘাট ফাঁকা হবার পর আমার ছোট্ট ডেরা থেকে আবার ফিরে এসেছিলাম পরিত্যক্ত জাহাজটাকে দেখতে। হাল্কা ঢেউয়ে জাহাজটা সামান্য নড়ছে। এতো কোলাহল, এতো হৈ চৈ কোথায় সব মিলিয়ে গেছে। মৃত সন্তান কোলে করে মায়ের আগলে বসে থাকার মতো। জাহাজটার প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল না। মাঝি-মাল্লা দুচারজন দড়াদড়ি টেনে পরিষ্কার করছে জাহাজটাকে। গত চৌদ্দটা দিনের সব চিহ্ন ধূয়ে দিচ্ছে। মুছে দিচ্ছে। খানিক্ষণ দেখে আমারও ভালো লাগেনি। বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে।

জেনোয়া দেখতে সুন্দর। হঠাৎ চট্ করে চোখে লাগে। শহরটা ঠিক পাহাড় বেয়ে উঠেছে। আবহাওয়া আলাদা। কিন্তু পরিবেশে কেমন যেনো পূবদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইউরোপের প্রাচুর্যের তুলনায় হয়তো অর্থনীতিবিদরা বলবেন গরীবের দেশ। আমাদের দেশের মতো রাস্তায় ভিখিরী আছে। মা বাচ্চা কোলে করে বিদেশীদের কাছ থেকে ভিক্ষে চায়। অল্প বয়েসি ছেলে ছোকরারা ভিক্ষে করছে সিগারেট। আবার তেমনি

রয়েছে মমত্ববোধ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের চেহারায় কোথায় যেনো একটা লজ্জার আভাস উঁকি মারছে। ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস।

শহরের কোলে কোলে 'কফি বার ক্যপুচিনু'। প্রত্যেক দোকানে সমান ভিড়। লোকজনের আনাগোনার যেনো কমতি নেই। আড্ডা জমাতে জুড়ি নেই। সহজে রেগে গিয়ে আবার সহজে ঠাণ্ডা হওয়া এদের স্বভাব। হাসি ঠাট্টা তামাসা আমোদ আর গান দিয়ে যে কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ঘোরাঘুরির মধ্যে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সিনেমা হলগুলোর বাইরে ভিড় নেই। লোক ডেকে ডেকে সিনেমা দেখানো হচ্ছে। কোথাও ছোট্ট খুপরির মতো ঘরে উঁচুতালের সঙ্গে স্বল্পমাত্র জামা কাপড় গায়ে কয়েকটি মেয়ে নাচের হৈ হুল্লোরে মেতে উঠেছে। নাবিকদের চড়া গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

জেনোয়ার জাহাজ বন্দর, মাটির ওপর নাবিকদের ছু দণ্ড দাঁড়াবার জায়গা। জাহাজ ভাসলে ওরাও ভাসবে। জাহাজ সব বন্দরে থামলেও ওরা থামে না। ওদের কাজ চলে যতোদিন না জাহাজ তার নিজের দেশের বন্দরে ভিড়ে টুকিটাকি মেরামতের কাজে যাচ্ছে।

ছোট ছোট ঘরগুলে পেরিয়ে এসে রেষ্টুরেণ্টে বসেছিলাম। ফার্ণান্দেজ তখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর এণ্টনি আর রোজেলিনির কি হলো শোনার জন্য মনে মনে আগ্রহ থাকলেও বেশী কৌতুহল দেখাতে কেমন যেনো বাধো বাধো ঠেকছিলো। ফার্ণান্দেজ আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো।

বুড়ো একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো পাকো বেরিয়ে যেতে এণ্টনি প্রায় ঝাপিয়ে পরলো রোজেলিনির ওপরে। মারধর চললো দুজনের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ ছলুস্থুলুর পর বেগতিক দেখে রোজেলিনি বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

এন্টনির সাধের বিকেলটা নষ্ট হয়ে গেলো। ঠাণ্ডার মধ্যে এন্টনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে বসলো গিয়ে ওই পাড়ার শরাবখানাটায়।

বাকী কথাগুলো বলতে গিয়ে ফার্ণান্দেজের গলার স্বর অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল। হয়তো বিয়ারের প্রথম ধাক্কাটা তখন কাজ করতে শুরু করছে। মনে হলো এন্টনির প্রতি ও যেনো একটা অন্তরঙ্গতা বোধ করছে। এন্টনির দুঃখটা হয়তো বা লেগেছিলো ফার্ণান্দেজেরও।

'বিকেল থেকে শরাবখানায় বসে আকণ্ঠ মদ খেলো এন্টনি। শরাবখানার সেই মেয়েটা দু একবার কথা বলতে এসেছিল। এন্টনি সে দিনটায় একদম পাত্তা দেয়নি মেয়েটাকে। আবার সব স্বাভাবিক হয়ে এলো। ঝগড়া বিবাদ মিটতে বেশী সময় লাগেনি। পরের দিন আবার এন্টনির সেই মাছ ধরা। আর রোজেলিনির সংসার।

ফার্ণান্দেজের কাছে জেনেছিলুম বাকীটা।

সে দিনের ঘটনায় ওদের জীবনে পরিবর্ত্তন খুব একটা আনেনি।

জীবন তার গতি নিয়ে এগিয়ে চললো জেনোয়ার সমুদ্র কূলের এন্টনির সংসার বয়ে চললো সাগর জলের মতোই একুল থেকে ওকুলে। বিক্ষুব্ধ হলে আছড়ে পড়ে। কখনও ওঠে তুফান। আবার সব ঠাণ্ডা। তবে জল আর মাটির দ্বন্দ্ব লেগেই রইলো। হয়তো থাকবেও বা।

যখন ঘুম ভাঙলো ট্রেনটা তখন আল্পসের মধ্যদিয়ে চলেছে। ইওরোপের প্রথম চেনা জগৎটা কখন চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। ঘুমের মধ্যে বুঝতেও পারিনি। ট্রেনে বসার পর ষ্টেশন পেরতে গাড়ীর দুলকি তালে তন্দ্রা এলো। এখন চলেছি আল্পসের কোলের ওপর দিয়ে। জুলাই মাস হলেও ঠাণ্ডার আমেজ পাচ্ছি ঠিক শীতকালের মতোই। জানালার কাঁচ তোলা। বাইরে বিশাল পাইন গাছগুলো আর পাহাড়ের সারি। অন্ধকারের সঙ্গে কুয়াশা মিশে গিয়ে মায়াজালের সৃষ্টি হয়েছে। কেমন যেনো একটা ধোঁয়াটে ভাব। চোখের দৃষ্টি বেশী দুর যায় না। কিন্তু যতোটা

যাচ্ছে তাতেই বার বার মনে করিয়ে দেয় এর বিশালতা। চোখে তন্দ্রা। সামনে পাহাড়। তার সঙ্গে ঠাণ্ডার আমেজ মিলিয়ে নীবিড়তা নেমে এলো। আবার ঘুমিয়ে পরলাম। ঘুম যখন ভাঙলো আচমকা যেনো চোখের দৃষ্টি হোচট খেলো। কুয়াশার জাল ভেদ করে ফুটফুটে সকালের রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। বাইরের দু একটা লেখায় বুঝতে পারলাম ট্রেন চলেছে সুইৎসারল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে। আগ্রহের চোটে উল্টোদিকের সীটে বসা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম। 'জুরিখ আর কতদূর'?

ভদ্রলোক হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললেন 'উই শ্যাল বি দেয়ার উইদিন নেক্সট ফিফটিন মিনিটস অর সো'।

পনেরো মিনিটের মধ্যে জুরিখ পৌছোবো। জিনিস পত্র বাধাবাধি করার কিছু নেই। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে চুল ব্রাস করে তৈরী হয়ে নিলাম।

ট্রেনের গতি খানিকটা কমে এলো।

অজানা ভয় এসে উঁকি মারছে মনের মধ্যে। আন্তর্জাতীক সংস্থার খোদ কর্ত্তা হয়তো নিজেই আসবেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে! মনে মনে দুচার বার কেতাব দুরস্ত কথা বার্ত্তাগুলো আওড়ে নিলাম।

গাড়ী এবারে দুরন্ত বেগ শান্ত করে ঢুকে পরলো ষ্টেশনে। ট্রেনের বাইরে মুখ বাড়িয়ে যাকে দেখি সবাইকে অচেনা লাগে। মনে হচ্ছে সবাই বুঝি আমার দিকে তাকিয়ে, মুখের ভাবখানা বুঝতে চাইছে আমিই সেই লোক কিনা! না। যে যার মতো চলে গেলো। আমায় অভ্যর্থনা করতে কেউ এগিয়ে এলো না। মনটা দমে এলো। কেমন যেনো মিইয়ে গেলাম। রাগ হচ্ছিল সুতপার ওপর। যদি একবারও হাতে পায়ে ধরে বলতো 'বিলেত গিয়ে কাজ নেই'; কে আসতো এতোদূর দেশে। রক্ষা পেয়ে যেতাম এ বিপদের হাত থেকে। বিপদের কথা মনে হতে মনটা রুখে দাঁড়ালো। এতোদূর যখন এসেছি দেখাই যাক এর পরে কি আছে!

আমি যখন ট্যাক্সি ধরতে এগিয়ে গেলাম ষ্টেশন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। ঠিকানাটা ভালো করে বলে দিলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। জুরিখ শহর আমার কাছে মনে হচ্ছে কল্পনার জগৎ। মনে পড়ে যে বার প্রথম চাঁদপুর থেকে ষ্টীমারে করে গোয়ালন্দ হয়ে কোলকাতা এলাম, সে দিনটার কথা। শেয়ালদা ষ্টেশন দেখেইতো বাবার কোটের হাতা শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম। বয়েস ছিল খুবই সামান্য তাই বড্ড বেশী হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমার চব্বিশ বছরের চোখে আজকে জুরিখও অনেকটা তেমনি।

সবাই ব্যস্ত। অহেতুক কৌতুহল নেই। মানুষের জীবন যাত্রা আর ব্যস্ততার একটা নতুন দিক খুলে গেলো। সুইৎসারল্যাণ্ডের মধ্যদিয়ে ইওরোপকে দেখলে প্রভেদটা একটু বেশী চোখে পড়ে।

অন্তর্জাতীক সংস্থার অফিসের দরজায় বেল দিতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দিলো। মুখটা এমন হাসি হাসি করে হ্যাণ্ডসেক করবার জন্য হাত বাড়ালো, মনে হচ্ছে। এতক্ষন আমরাই প্রতীক্ষায় বসেছিলো। রাগ আর আকাঙ্খা মনের ভেতরে রেখে আমিও ততক্ষনে হাত বারিয়ে দিয়েছি।

আই এম সিস্তর, ইউ আর………।

বিনয়ের সঙ্গে মাথা নুইয়ে জানালাম হ্যাঁ আমিই সেই ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক। ইওরোপের শ্রমদান শিবিরে অংশ গ্রহন করতে এসেছি'।

'কেটি ইজ মাই নেইম। হোয়াট ইজ ইওরস'?

•'…………আমার নাম'।

কেটি জানালো অতো শক্ত নাম ওর পক্ষে সম্ভব নয় মনে রাখা। তার চেয়ে নামটাকে ছোট করে ও আমার নাম দিলো ডিপি।

'তা হলে তোমাকে ও নামেই ডাকবো'।

কেটির সঙ্গে রফা হয়ে গেল। বেশী কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তক্ষুনি। কেটির কাছে জানতে পারলাম, আমি যে ট্রেনটায় এলাম সেটা অনেক দেরী করে এসেছে। আন্তর্জাতিক

সংস্থার সেক্রেটারি খুব ভোরে জুরিখের বাইরে কোথায় গেছেন তাই ষ্টেশনে যেতে পারেন নি। কেটিকে বলা ছিল আমার আসার কথা।

সকাল বেলার ঠাণ্ডায় হাড়ে কাঁপুনি লাগছিলো। বাইরে দাঁড়িয়ে আলাপ আর বেশী গড়াতে না দিয়ে ঢুকে এলাম বাড়ীর ভেতরে।

কেটি আমার থাকার ঘর আর বাথরুম দেখিয়ে দিলো। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করার পর কেটি এসে দরজায় টোকা মারছিলো।

'কি ব্যপার এখনো ঘুমুচ্ছো নাকি' ?

তৈরী হয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম দু একটা চিঠি লিখবো দেশে। বললাম 'ভিতরে এসো'।

কেটি সকাল বেলার জামা কাপড় বদলেছে। হাল্কা রঙের পোষাকটাতে বেশ মানিয়েছে ওকে। কেটিকে দেখে ওর বয়েস আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি ওর বয়স আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ছটফটে। কথা বলে মিনিটে একষট্টিটা। কোন জড়তা নেই। সহজ স্বাভাবিক সরলতায় ভরা ওর চোখ দুটো। কেটি বললো 'চলো তোমার জন্য খাবার তৈরী করে বসে আছি'।

সমস্ত বাড়ীটাই আন্তর্জাতিক সমাজ সেবা সংস্থার অফিস। আর বাইরের লোকেদের থাকবার জায়গাও বটে। জুরিখের রাস্তায় যে সব বাড়ী চোখে পড়লো তার তুলনায় বেশ বড় বাড়ী। বর্তমানে প্রাণী বাস করে পাঁচজন মাত্র। প্রধান অফিসের পাশের ঘরটায় কেটি আর ওর একজন বান্ধবী, ডরোথী। ডানদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন এক ফরাসী দম্পতি আর তাদের কুকুর হুইস্কি। ছোট গেষ্ট রুমটায় জায়গা হয়েছে আমার।

সুইসদের প্রাচুর্য্যের পেছনে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী জায়গায় কম লোক বসতি। আবার সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমানে মৌলিক শিল্প ও ব্যবসা। এরা খরচায় মিতব্যয়ি। যুদ্ধ বিগ্রহ কি জিনিষ বহুদিন ধরে তা দেখেনি। গতো দুটো মহাযুদ্ধ বড় বেশী প্রকোপ ফেলতে পারেনি সুইসদের ওপর। খাবারে ভেজাল দেবার দরকার

পড়েনি, পড়েনি লোক ঠকানোর দরকার। লোকজনের আর ভিড়ের অভাবটা আমিও বুঝতে পারছিলাম। এতো চুপ চাপ যে মাঝে মাঝে কান ভো ভো করছিলো।

কেটি আমার কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলছিলো, এখানকার কাজ-কর্মের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে নানা দেশের ছেলে মেয়েরা আসে স্বেচ্ছার সব রকম কাজ করতে। শ্রম দান বোধ করি এ দেশের সব চাইতে বড় দান। অর্থ প্রয়োজন হলে প্রচুর পাওয়া হায়। কলকব্জা আর আসবাব পত্র পাওয়া যায় চাইবা মাত্র। কিন্তু যখন তখন সব রকম কাজ করার লোকজন পাওয়া যায় না। তারপর আবার স্বেচ্ছা শ্রমের তো কথাই নেই।

কেউ বা কাজ করে খামারে। কেউ শ্রম দেয়, বাড়ী ঘরদোর বানানো আর মেরামতি কাজে। কারো আবার ভালো লাগে হাঁসপাতালে কিম্বা বুড়োবুড়িদের সঙ্গে সময় কাটাতে। যাকে বলা হয় 'ওল্ড পিপলস. হোম', সেখানে স্থান পেয়েছেন হাজারো বৃদ্ধ আর বৃদ্ধারা। হয়তো তাদের কাছে সব কিছুই ঘড়ির কাঁটাধরে আসছে। আসছে না সঙ্গ দেবার কেউ। কারো কারো সঙ্গ দেবার নিকট আত্মীয় কেউ নেই। আর যাদের আছে তাদের সময় নেই।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য আবার বহু এদেশের অল্পবয়েসি ছেলে-মেয়েরা যাচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশে, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায়।

চা খেতে খেতে মনযোগ দিয়ে শুনছিলাম কেটির কথা। কেটির বচন ভঙ্গী সত্যি লক্ষ্য করবার মতো। অর্থবীহিন কথায় অর্থ সৃষ্টি করতে পারে কেটি। মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর কথা শুনি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় অথচ মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। চোখে আলোর চমক লেগেছিল। কেটি আমার ইউরোপীয় জীবনের প্রথম চমক।

খানিক গল্প করে কেটি আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। আন্ত-র্জাতিক সংস্থার সেক্রেটারীর বাড়ী যাবো। জুরিখ শহর থেকে ওদের বাড়ী প্রায় মাইল চব্বিশেক বাইরে। রাস্তায় বেরিয়ে কেটি গায়ের সোয়েটারটা খুলে ফেললো। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি ব্যাপার' ?

'বাইরে কি সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে দেখছো না' !

এখানকার 'সামার' ততক্ষণে আমার হাড়ে হাড়ে কাপন লাগছে। কয়েকদিন পরে বুঝলাম, প্রথম প্রথম ঠাণ্ডাটা একটু বেশীই লাগে।

মোটর, শহুরে রাস্তা পেরিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলেছে। সুইৎসারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে এর গ্রাম-গুলোতে। শহরের পরিবেশটাকে খানিকটা সাজানো মনে হচ্ছিল। কেমন যেন চেষ্টা করে স্বাভাবিক করার প্রয়াস। কিন্তু গ্রামগুলোতে অবাস্তব কিছু নেই। প্রকৃতিকে আপন করে ধরে রেখেছে গ্রামীন পরিবেশ। অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাম পরলো আমাদের চলার রাস্তায়। দু পাশে গম যবের ক্ষেত। আবার কোথাও আঙুর আর গাছ ভরা গুচ্ছ গুচ্ছ আপেল। নীবিড় শান্ত প্রকৃতি। কি রকম যেনো ভাবালুতা জড়ানো। মাঝে রয়েছে ছোট ছোট খালের মতো, এরা অবশ্য বলে থাকে নদী। খামারবাড়ীর ঢঙ সবগুলোর একই রকম। বরফ আটকানোয় জন্য চওড়া দো-চালা টালির ছাউনি। প্রত্যেকের খামারের পাশ ট্রাকটর। গ্রাম হলেও রাস্তা ঘাট গুলো রিতীমতো লোকজনের যতন পায়। রাস্তার পাশের বাড়ীগুলোতে নানা রঙের ফুলের চাষ। সব বাড়ীতেই রুচিসম্মত ভাবে তলগুলো সাজান। হঠাৎ দেখে মনে হবে যেনো সব কটা বাড়ীই নিউ মার্কেটের ফুলের দোকান।

পাহাড়ী রাস্তাটা চড়াইতে উঠে টিলার পাশে বাঁক নিতেই গাড়ী ঢুকে পরলো হিয়োরলিম্যান সাহেবের বাড়ীতে।

সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। হিয়োরলিম্যান দম্পতির সঙ্গে আলাপ হলো। গত বিশ বছর ধরে আন্তর্জাতীক সংস্থার সঙ্গে কাজ

করছেন। মিঃ হিয়োরলিম্যান বলছিলেন ইওরোপের প্রাচুর্য্য আছে। শিক্ষা আছে। বিত্ত আছে। কিন্তু অভাব রয়েছে সহৃদয়তার। অভাব রয়েছে ত্যাগের। জীবনধারা রুটিনের মতো হয়ে গেলে হয়তো সবাই তাই চিন্তা করবেন। হয়তো আগামীতে মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্টের ব্যবস্থা দেওয়া হবে কম্পিউটার আর কলের মাধ্যমে। কম্পিউটার বলে দেবে কোন্ পুরুষ কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সারাজীবন অনাবিল শান্তি ভোগ করবেন। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষন মানুষকেই করতে হচ্ছে সব কিছু। মানুষের দুঃখ কষ্টে মানুষকেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে। পৌঁছে দিতে হচ্ছে সাহায্য। দাঁড়াতে হচ্ছে ম্রিয়মান মানুষের পাশে।

এমনি ধরনের একটি আন্তর্জাতীক সংস্থার সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন হিয়োরলিম্যান দম্পতি। মিঃ হিয়োরলিম্যান বলছিলেন 'ইওরোপের মানুষ যতো না ভুগছেন রোগ থেকে তার চেয়ে অনেকগুন বেশী ভুগছেন নীরবতা থেকে। নিঃসঙ্গ। নিজের মধ্যে নিজে একা। যারা বার্দ্ধক্যের কোঠায় পা বাড়িয়েছেন তাদের কষ্টোটা আরো বেশী। একাকীত্ব একটা রোগ যার প্রতিফলন শরীরের কোথাও প্রকাশ পায় না অথচ মনটাকে শেষ করে দেয়। রোগের প্রকাশ ছাড়া রোগ, আরো বেশী জ্বালা। আরো বেশী দহন। হাঁসপাতালগুলোতে বহু রোগী রয়েছে যারা ঘুমের কড়া ইঞ্জেকশন ছাড়া ঘুমতে পারে না। বাধ্য হয়ে ডাক্তার আর নার্সরা তাকে ইঞ্জেকশনের নামে বিশুদ্ধ জল ইঞ্জেকশন করে দেয়। রোগী দিব্যি আরামে সারা রাত ঘুমিয় সকাল বেলা ডাক্তার আর নার্সদের ধন্যবাদ দেন। এদের মতো হতভাগ্য আর কে আছে? মানুষ বহু মানুষের মধ্যে বাস করেও একাকী'।

মি: হিয়োরলিম্যানের গলার স্বরে একটা অনুনয়ের সুর বেরিয়ে এলো। 'এ দেশে যারা স্বেচ্ছাশ্রম করতে চান আমি তাদের প্রত্যেককে বলি, প্রথম কাজ হলো মানুষকে সঙ্গ দেওয়া। মানুষকে জানা'।

আলোচনা আর কথার ফাঁকে বাইরের দিকে তাকাতে পারিনি। সান্ধ্য গড়িয়ে বাইরে অন্ধকার জমে উঠেছে। আমাদের শহরে ফিরতে হবে। উঠতে চাইলেও উঠতে পারছিলাম না। এই খানিকটা সময়ের মধ্যেই মিশে গিয়েছিলাম হিয়োরলিম্যান দম্পতির সঙ্গে। শ্রদ্ধার সঙ্গে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন আমাদের দেশের।

সুইসরা শুধু অতিথিপরায়নই নয়। ওরা অন্যের স্বাধীন চিন্তা আর স্বকীয়তার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। নিজেরা কোনদিনই পরাধীন হয়নি। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই। কথাবার্ত্তা স্বচ্ছ আর প্রাঞ্জল। অন্যের প্রতি অসীম হৃদ্যতায় ভরা। নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপাবার অবান্তর যুক্তি তর্কের ধার ধারেনা। বরঞ্চ লক্ষ্য করছিলাম অন্যের যুক্তির টুকরো টুকরো অংশগুলো একত্রিত করে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মত গড়তে সব সময়ই সাহায্য করতে চায়।

কেটির সঙ্গে ফিরে এলাম শহরে। বাড়ীতে ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেলো দোতালার সেই ফরাসী দম্পতির সঙ্গে। ওরা থাকেন লুজান শহরে। জুরিখে এসেছেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। নাছোড়বান্দা, নিয়ে গেলেন ওদের ফ্ল্যাটে। কফি খেতেই হবে। ভারী আমুদে লোক। বাঁশী বাজিয়ে শোনালেন। বহুদেশ ঘুরেছেন। আপন পর বোধ খুব কম। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলে মুহূর্তে অন্তরঙ্গ হতে পারেন।

শুভ রাত্রি জানিয়ে কেটি যখন ওর শোবার ঘরে গেলো রাত্রি তখন দুটো।

আমি আমার ঘরে বসে চট্‌করে ভাববার চেষ্টা করছিলাম সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা। দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হয়েছে, মনেও পড়েনা সব ঘটনা গুলো।

আগামী সাত দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে দিয়েছে কেটি। ইওরোপের চলোমান জীবনের প্রথম ধাপ। লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কাজের মধ্য দিয়ে। কথা বার্ত্তার মধ্য দিয়ে।

বেশী প্রয়োজন আন্তরিকতার। খুব বেশী দূর ভাবতে পারছিলাম না। মনের কোনে কোথায় যেন একটা উদাস সুর বার বার আছড়ে পড়ছে। একটা জগত থেকে আরেকটা জগতের পরিচয়ের সন্ধিক্ষন। হয়তো বা দুয়ের সংমিশ্রনে নতুন আরো একটা কিছু!

ইওরোপ পাড়ি দেবার পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো কোলকাতার গণ্ডীকাট জীবনকে ফাঁকি দেওয়া।

মোটামুটি ছোট সংসার পেতে দিন গুজরান করার মতো রসদ ছিলো। মন ছিলো না। প্রাণ থাকবে অথচ তার চ্যালেঞ্জ থাকবে না, এ মানতে পারছিলাম না।

ফোঁটা কেটে, ফুলের মালা নিয়ে 'উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা' হয়ে ওঠেনি। বেরিয়ে ছিলাম নিঃশব্দে অনেককে না জানিয়ে।

জানবার কিছু ছিল না। থাকার মধ্যে সম্বল ছিলো ইউনিভার্সিটির একটা ডিগ্রি। আর নিজের ওপর খানিকটা বিশ্বাস।

আপার ডিভিশন ক্লার্কের 'আশি কম্ একশো' টাকা মাইনের চাকরিকে মনে হয়েছিলো গণ্ডীর মতোই। হারাবার ভয় বড় একটা ছিলো না কারন থাকলে তো হারাবো!

নতুন পথ খুঁজতে গিয়ে প্রথম ধাপেই পরিচয় হলো কেটির সঙ্গে। কেটিকে মনে হতো পাহাড়ী টিলা। ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দূরের পৃথিবীটাকে আরো পরিস্কার দেখতে পেতাম।

কেটিও খুঁজছিলো পথ। মুক্তির পথ। নিজের মধ্যে নিজের মুক্তি। চট্ করে জড়িয়ে পড়তে চায়নি কোন কিছুর সঙ্গে। নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছে না। দয়া আছে। সহানুভূতি আছে। কিন্তু মায়া আর অহেতুক আকর্ষনের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে নারাজ। উপলব্ধি করতে করতে চায় পৃথিবীটাকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। কোথায় কি ঘটছে তার খবর চাইছে।

কেটি কথায় কথায় বলছিলো, কাজ করতে চায় আফ্রিকা আর এশিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলোতে। হাজার হাজার মাইল দূরের অচেনা জগতের কথা ভাবলে একটা রোমাঞ্চ এসে ক্ষনেকের তরে ওকে পুলকিত করে তোলে। তবে অচেনার মধ্যে হারিয়ে যেতে শংকাও একটু রয়েছে।

সেদিন চা খাবার সময় হাসতে হাসতে বললো মনে করোন যেনো আমি হারিয়ে যাইনি। মন দেওয়া নেওয়ার পালায় নিজেকে ভুলেছি কখনো সখনো।

ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে কে না চায় বলো? তবে এ ব্যপারে আমি স্বার্থপর। শুধু ভালবাসার নাম করে এক্ষুনি সংসারে জড়িয়ে পড়তে রাজি নই।

কথাগুলো এক দমে বলে গম্ভীর হয়ে গেলো কেটি। হয়তো নিজের ভাবনাগুলো যখন স্তব্দ হয়ে নিজের কানে গেলো তারই বাস্তবতা ওকে গম্ভীর করে তুললো।

আরো সাধারন সুইস মেয়ের মতোই একটি মেয়ে কেটি। ওকে প্রথম দেখে কেউ বলতে পারবে না কেটি গম্ভীর হতে পারে। হাসতে না চাইলেও কেটি হাসাতে পারে। খুশী করতে পারে অন্যকে।

ওর হাসির ভেতরে ও নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ওর হাসি চকমকে দিনের আলোর মতো। তাই ধরতে পারা যায় না ওর ভেতরকার জমা মেঘের চিহ্নকে। জলভরা মেঘ। হাসির কিরণে মেঘ ঢাকা ছিলো।

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গবার পরই গরম কফি হাতে কেটি এসে হাজির। লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম দেরীতে ওঠার জন্য।

কেটি সু-প্রভাত জানিয়ে বললো 'চলো আজ তোমায় জুরিখ দেখাতে নিয়ে যাবো'।

আমার দ্বিধা ছিল না। কোট কাঁধে চাপিয়ে কেটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম জুরিখ দেখতে।

রাস্তায় নামতেই কেটির সেই লাফানো স্বভাব। কেটি বললো

‘চলো ছুটে গিয়ে ট্রামটা ধরে ফেলি’। দুজনে ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লাম।

শহরের এপাশের নিস্তব্ধতা পেরিয়ে আমরা গিয়ে পৌছুলাম সাপ্তাহিক এক হাটে। আশে পাশের গ্রাম থেকে চাষীরা এসেছে যে যার পসরা নিয়ে। সওদা নিয়ে। নানারকম তরকারী মাছ ফল আর সব্জীর বন্যা। ‘গ্রীষ্মের ফুল’ উঁকি মারছে ষ্টলগুলো থেকে।

যারা বিক্রি করতে এসেছে, সবাই প্রায় বুড়ো আর বুড়ি। ছেলে ছোকরা একদম নেই। মুখগুলো খুশিতে ভরা। চামড়ায় টান ধরেছে। ফসা রঙ তার ওপর দিনটা ভালো। অদ্ভুত লাগছে এদের দেখতে। মাথায় এমেব্রাডারি করা ফিতে দিয়ে এলো মেলো চুল গুলোকে হাওয়া থেকে আটকে রেখেছে। গোড়ালি পর্যান্ত লম্বা পেটিকোটের মতো স্কার্ট। রঙ বেরঙের স্কার্টে মোটা সোটা মানুষগুলোই একটা দেখার বিষয় বলে মনে হলো।

ভীড়ের মধ্যে কখন কেটি আমার হাত ধরেছে খেয়াল ছিলো না। ঘুরিয়ে দেখালো সবটা বাজার। অনেকটা আমাদের দেশের পাহাড়ী বাজারের মতো। তবে যেখানে সেখানে ছড়ানো নয়। রুচিসম্মত ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সওদাকে মনোরম করে তুলে ধরা হয়েছে খদ্দেরদের সামনে। দর দস্তুর নেই। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করছে না। সওদা ওজন করে রঙীন কাগজের ঠোঙায় ভরে দিচ্ছে। দমে দিয়ে যে যার কাজ চলে যাচ্ছে সৌজন্যতা দেখাতে কেউ কম যাবে না। ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেলে কেউ ছাড়বে না। এরই মাঝে দু এক টুকরো কথা বার্তা।

‘ভারী সুন্দর দিন হয়েছে আজ। আর কটাদিন এমনি রোদ্দুর থাকলে যবের চারাগুলো বেশ খানিকটা বেড়ে উঠতে পারে’।

উত্তরে হয়তো অন্যজন বলবে ‘কিপ ইওর ফিঙ্গার ক্রশড’।

‘যা বলছো। ঈশ্বর ভরসা’ বলে হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে যাবে খদ্দের।

হাটের কোলাহল পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমরা যখন হাট দেখে জুরিখে ফিরলাম তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে।

আরো কটাদিন কেটে গেলো জুরিখে। কেটি আমায় পরিচয় করিয়ে দিলো সুইৎসারল্যাণ্ডের জীবনের সঙ্গে। অদ্ভুত খাটতে পারে এরা। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে কাজে যায়। এক নাগাড়ে কাজ করে চলে দুপুর সাড়ে বারোটা অব্দি। দু ঘণ্টার ছুটি। যে যার বাড়ী চলে যায় লাঞ্চ খেতে। স্বামী আর স্ত্রী এক সঙ্গে বসে লাঞ্চ খেতে। স্বামী আর স্ত্রী এক সঙ্গে বসে লাঞ্চ খেতে বসে টুকিটাকি কাজকর্মের হিসেব নিকেশ চলে। বাচ্চাদের সঙ্গে একটু খেলা করে আবার যে যার কাজে চলে যান।

কেউবা আবার ওই সময়ে দোকান পাট কেনা কাটা সেরে রাখেন। ব্যাঙ্ক আর ঐ ধরণের আপিস খোলা থাকে যাতে লাঞ্চের ফাঁকে দরকারী কাজ সারা যায়। সবাই প্রায় চলেছে এক নিয়মে।

কেটি আর আমার নিয়ম করে করবার কিছু ছিলো না। আমরা স্বাধীন শহরের কোলাহল পেরিয়ে গ্রাম দেখলাম। ফ্যাক্টরী দেখলাম।

সব পেরিয়ে আমরা চলে এলাম পুরানো রোমান আমলের একটা কেল্লার সামনে। কেল্লার সামনে। কেল্লার পাশে স্বচ্ছ জলের ফুট ফুটে লেক।

গ্রীষ্মের পাতাভরা গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছিলাম জলের ওপর আমাদের ছায়াকে। রোদ্দুরে গাছের সবুজ পাতা-গুলোকে মনে হচ্ছে জীবন্ত। বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথা দোলাচ্ছে।

কেল্লা পেরিয়ে লেকের পূব ধারে গির্জা। মাঝখানে পাহাড়ী টিলা।

পরিবেশটা কেটির পরিচিত। বারবার লেকের জল হাতে তুলে কেটি জলের ঠাণ্ডা ভাবটা অনুভব করবার চেষ্টা করছিল। একবার আমার দিকে জল ছিটোবার চেষ্টা করলো। নিজের মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে নিজেই চোখ বন্ধ করে ফেললো।

কেটি আর আমি যখন গির্জার প্রার্থনা বেঞ্চে এসে বসলাম তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

বেঞ্চে বসেই বুঝতে পারলাম অনেকটা পথ ছুটে এসেছি। চলার সময় খেয়াল ছিলোনা অতোটা চড়াই পেরিয়ে এসেছি।

পাহাড়টার গা বেয়ে বেয়ে আসার পথে কেটি বলছিলো ওর বাবা মা আর পরিবারের কথা।

ও জন্মেছিলো এ পাড়ায়। বাবা মার সঙ্গে কাটানো জীবনের দিনগুলোর আলাদা স্বাদ ছিলো। দিনগুলোর কথা ওর এখন ভাবতেও ভালো লাগে। ও আমাকে দেখালো, এ পাড়ার কোন্ দোকান থেকে এসেছিলো ওর পেরাম্বুলেটর। কোন্ গাছটা ও দেখে আসছে ছোটবেলা থেকে। হয়তো বা ওরই বয়েসি সে গাছটা। কোন্ জলে কেটি প্রথম দেখেছিলো ওর প্রতিবিম্ব।

কথার মাঝে খেয়াল ছিলো না বেলা কতদূর। দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাবলাম এবারে ফেরা যাক্।

কেটি নাছোড়বান্দা। এ পাড়ায় যখন এসেছি জুরিখের আর্ট গ্যালরী আমাকে দেখাবেই।

ছোট্ট আর্ট গ্যালরী। পরিচ্ছন্ন। সব যুগের কিছু কিছু প্রতীক রয়েছে। নামকরা বহু শিল্পির ছোট বড় ছবিতে সব রকম রুচির স্বাদ মেলে। ইওরোপীয় চিত্রশালার সঙ্গে পরিচয় বলতে গেলে এই আমার প্রথম।

গ্যালরীর পর গ্যালারীতে ঘুরছি। কেটি বলে যাচ্ছে ওর জীবনের গ্যালারীতে রাখা নানা দিনের নানা রঙের স্মৃতির কথা।

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিলো। গ্যালারী থেকে বেরিয়ে ছোট একটা কফি খানায় ঢুকে পরলাম আমরা।

ওকে কিছুটা ক্লান্ত বলে বোধ হলো। হয়তো বা শৈশবের স্মৃতি ওকে বিহ্বল করে তুলেছে। ক্লান্তির পর গরম কফি পেয়ে আমারও বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল।

চমক ভাঙ্গলো কেটির প্রশ্নে। কেটি আমায় জিজ্ঞাসা করলো ‘হান্সকে ভালো লাগে তোমার’?

চট করে বুঝতে পারিনি বললাম ‘কোন হান্সের কথা বলছো’?

‘হান্স লুডভিক। সেই যে লম্বা মস্তো চেহারা! আরে, মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় আমরা একত্রে বসে চা খেলাম, এর মধ্যে ভুলে গেলে’!

ক্ষমা চেয়ে বললাম ঠিক মনে করতে পারিনি।

কেটি এবারে উৎসাহ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো। ‘কেমন লাগে তোমার হান্সকে? জানো, আজ রাত্তিরে ওকে আমার সঙ্গে খেতে ডেকেছি’।

এতে অবাক হবার কি আছে, এই ধরণের একটা ভাব করে বললাম ‘সে তো ভালো কথা’।

কেটি আমার জবাবে বোধহয় সন্তুষ্ট হলো না।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কেটি বললো ‘হান্স সত্যি লোক ভালো’। ওর চোখের কোনে কেমন যেনো একটু দুষ্টু হাসির ঝিলিক খেলে গেলো।

হান্স লুডভিকের প্রসঙ্গ আবার তুলতে কথায় কথায় মনে হলো ও যেনো কিছুটা সমর্থন খুঁজছে। এই প্রথম দেখলাম কেটিকে বিচলিত হতে।

কেটির আবেগ কফির কাপ থেকে ধোয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠছে। বন্যার স্রোতে এগিয়ে যাচ্ছে কেটি।

গতো গ্রীষ্মে ও গিয়েছিলো ইংলণ্ডে। কন্টিনেন্টের মেয়েদের ইংরেজী শেখার শখ অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখার মতো। ইংরেজীর প্রতি ভালোবাসায় না হলেও ইংরেজী শিখলে পৃথিবীর বহু লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়, এটাই আগ্রহ। তাই ইংরেজী শেখাটা এদের অনেকের কাছে অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে হয়।

কেটির ছিল দুটো লক্ষ্য। আন্তর্জাতীক স্বেচ্ছাশিবিরে কাজ করা। আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শেখা।

সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল জনার্থনের সঙ্গে। ইয়র্কশায়ারের গ্রামে স্বেচ্ছাসেবী শিবিরে আলাপ।

আলাপ থেকে পরিচয়। ক্যাম্প জমে উঠলো। কাজও হলো প্রচুর। আবার তিন সপ্তাহ পরে ক্যাম্প শেষ। যে যার দেশে চলে যাবে।

কেটি আর জনাথন শেষ দিনটায় গি' বুঝতে পারলো, কি যেন খোয়া গিয়েছে। সঙ্গে যা এনেছিল তা'র কোথা যেনো টান পড়েছে।

শিবির শেষ হবার আগের দিন সন্ধ্যায় গ্রামের পাশে বসে দুজনে বিয়ার খাচ্ছিল। এরই মাঝে জনাথন কেটির হাতে হাত রেখে বলেছিলো 'তোমাকে আমার অনেক বেশী আপনার মনে হচ্ছে। এর আগে এতো নীবিড় করে আর কাউকে পেতে ইচ্ছে করে নি'।

জনাথন এসেছিল লণ্ডন পর্য্যন্ত। আর লণ্ডনেই পাকা কথা চেয়েছিলো কেটির কাছ থেকে।

কেটির জীবনে সেটা একটা অবিস্মরণীয় দিন। ছোট বেলা থেকে যে কথাটা বার বার মনে ভাবছে, কবে কোন রাজপুত্র এসে বলবে 'তোমাকে আমি চাই। তুমি কি আমায় গ্রহন করবে'?

কথার রেশ শেষ হবার আগে নীবিড় ভাবে কেটিকে চুমু খেলো জনাথন। হৃদয়ের আবেগ ভেতর থেকে উঠে এসেছিলো কেটির। জনাথনের সব সত্বাকে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলো কেটি। আরো কাছে পেতে চায়। আরো ঘনিষ্ঠ।

জনাথনের কথার জবাবে কেটি বলেছিলো, 'আমায় লজ্জা দিয়ো না জনাথন। আমিও তোমার হতে চাই'।

কেটি চলে এলো জুরিখে। কাজের মাঝে ডুবে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে মন ডুবে রইলো জনাথনের বুকে।

জনাথন এলো মার্চ মাসে। ঠিক তার দুইদিন আগে এসেছিলো আন্তর্জাতীক সংস্থার কাছ থেকে চিঠি।

সংস্থা ওকে ঘানা যাবার জন্য মনোনীত করেছে। সময় খুব কম, তৈরী হয়ে নিতে হবে এক মাসের মধ্যে।

কেটি ভেবেছিলো জনাথন খুশি হবে ঘানা যাবার কথা শুনে।

কিন্তু জনাথন তখন ভাবছে জীবন গড়ার কথা। বিয়ে থা করে সংসার শুরু করার কথা চিন্তা করছে। আগামী মাসেই জনাথন বিয়ে করতে চায় কেটিকে।

জনাথনের ছুটির পুরো সাতদিন ধরে অনেক কথা কাটাকাটি হলো। চললো একে অন্যকে বোঝানোর পালা।

জীবনের অর্ডার দেওয়া তৈরী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফেলে কেটির ঘানা যাবার কারণ জনাথন বুঝতে পারেনি। বিয়ের চেয়েও বেশী করে আকর্ষণ করলো ঘানার বন জঙ্গল! রাগ অভিমান কিছুতেই যখন আর মানানো গেলো না জনাথন পাড়ি দিলো ইংল্যাণ্ডের পথে।

ঘানা যাওয়া বন্ধ করলো না কেটি।

জনাথন চাইছিলো কেটি একেবারে সম্পর্ক চুকিয়ে দিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে। কেটির তা মনে হলো, অসম্ভব।

কফির শুকনো পেয়ালাটা নাড়তে নাড়তে বাইরের দিকে তাকিয়ে কেটি বললো 'জানো ডিপি, জনাথনকে দুঃখ দিতে পারলাম শুধু এই কথা ভেবে যে আমার কাজের অপেক্ষায় আছে বহু লোক। ঘানায় যে স্কুলটায় আমার কাজ করার কথা আছে তার প্রধান শিক্ষক আমায় লিখেছেন, ওরা অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

জনাথন আমার জীবনের বাস্তবতার দিকটা খুলে দিতে চাইছিলো। কিন্তু বাস্তবের চেয়ে আদর্শ আমায় বেশী কাছে টানলো।

'এটাকে আমি ত্যাগ বলবো না। এটা হলো আমার গোঁ'।

একটু হেসে কেটি আমার হাতে চাপ দিয়ে বললো 'ছোট বেলা থেকে এই গোঁ ধরাই সব চাইতে বড় সম্বল'।

অনেক্ষন পরে কেটি বললো। জনাথন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে

চিঠি লিখেছিলো। ওর সেই জেদ আমার ঘানা যাওয়া চলবে না আর সংস্থা ছাড়াতে হবে। জনাথন মনে আঘাত পাবে বলে চিঠি দিয়ে আর ঝগড়া বাধাইনি। প্রথমটায় ধাক্কা লেগেছিলো। এখন আবার সব সয়ে গেছে।

'এ জীবনটাই বা খারাপ কিসের'? খানিকটা স্বান্তনার সুরে বলেছিলাম কেটিকে।

কথাটা ওর ভালো লাগলো।

'ঠিকই বলছো। চলতে আমার বেশ ভালো লাগে। পরে ভেবে দেখেছিলাম জনাথনের সঙ্গে ইংলণ্ডে না গিয়ে বোধহয় খারাপ কিছু হয় নি'।

জানো ডিপি, যা তুমি চাইবে, কখনো সব কিছু পাওয়া যায় না। তাই দুই এর মধ্যে তোমায় বেছে নিতে হবে।

কেটি নিজের সান্তনা নিজেই খোঁজবার চেষ্টা করছে। কেটির কথার মধ্যে আবার গম্ভীরতা নেবে এলো। এই তো আর দুটো সপ্তাহ। তারপর যাচ্ছি ঘানাতে। চার বছর থাকবো। যাবার আগে হান্সের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। ও যদি অপেক্ষা করে আমার জন্য, ফিরে এসে হান্সকে বিয়ে করবো।

কেটির নিজের কথায় নিজের চমক লাগলো। জোর করে হেসে উঠে ওর দুর্ব্বলতা ঢাকতে চাইলো 'হয়তো বা আর কোনদিন বিয়ে করবো, এ কথাটাই ভাববো না'।

অনেকক্ষন কথা বলিনি আমরা। কেটি স্বার্থকতা খুঁজছে নিজের কাজের। আমি খুঁজছি দাঁড়াবার ঠাই। লক্ষ্য একই। সম্বল আদর্শ।

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর ফিরে এলাম দোতলার সেই ঘরটাতে। শেষ হয়ে আসছিলো জুরিখের গোনা বাধা কটাদিন। কাল সকালে চলে যাবো লুৎসার্ণে।

উত্তরের জানালা দিয়ে আল্পস পাহাড়ের দু একটা চুড়া অস্পষ্ট

ভাবে দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ছে কেটি আর জনাথনের কথা। সুইস আল্পসে বরফে ঢাকা পড়ে থাকবে কেটি আর জনাথনের কয়েকদিনের পরিচয়ে। কোন দিশারী না রেখে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো সেই দিন গুলো। কেউ মাথা ঘামায় না এ নিয়ে। কিন্তু কেটির বলার ভঙ্গীতে লক্ষ্য করছিলাম কোথায় যেন একটা হতাশার আবেগ উঁকি মারছিল।

জুরিখের কটাদিন কেটির সংসর্গে ভালোই কেটেছে। চলে যাচ্ছি একটা পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে। কদিনে কেটির সঙ্গে বন্ধুত্বের বাধনে ধরা পড়লাম। সুইট্যংসারল্যাণ্ড থেকে ও যাচ্ছে ঘানাতে কাজ করতে। সুদূর ভারত থেকে আমি এসেছি ইওরোপে কাজ করতে। ক্ষেত্র আলাদা উদ্দেশ্য এক। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে কেটি। এগিয়ে চলেছি আমি। কেটি বলছিলো। আর যা কিছু তা হলো যৌবনের উচ্ছাস। এক্সুবারেন্স।

কেটির রুম মেইট্ ডরোথী যাবে লুৎসার্ণে। কথা হোল ওর সঙ্গে যাবো।

সকালবেলা ডরোথী আর আমি পাহাড়ে ওঠার জুতো পরে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে লুৎসার্ণে যাবার জন্য রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই দিকে যাবার মোটর থামিয়ে লুৎসার্ণে পৌঁছনোর বুদ্ধিটা জুগিয়ে ছিল ডরোথী।

ঠিক করে নিলাম প্রথমে আমরা যাবো পঁচিশ কিলো মিটার দূরে রিগি পাহাড় বলে একটা জায়গায়। ডরোথী বলেছিলো আল্পসের এ অঞ্চলটা না দেখলে নাকি আল্পসকে বোঝা যায় না।

জুরিখ ছাড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ডরোথী বুড়ো আঙ্গুলের ইশারা করে থামাতে চাইছিলো মোটর গাড়ী।

মোটর যাত্রীরা সত্যি বিনয়ী। অনেকটা ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে বলে যাচ্ছে জায়গা নেই।

হঠাৎ একটা মোটর থামলো আমাদের দেখে। ডরোথী সুইস-

জার্মান ভাষায় বোঝালো আমরা রিগিতে যেতে চাই। সবটা বুঝতে পারলাম না। তবে ভদ্রলোকের আপ্যায়নে আমি আর ডরোথী গাড়ীতে উঠে বসলাম।

কথা বার্তায় বুঝতে পারলাম ওরা আমাদের রিগির বদলে লুৎসার্ণের কাছেই একটা গ্রাম্য উৎসব দেখাতে চায়। বিশেষ করে আমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমরা যেতে পারি সে উৎসব দেখতে।

রাস্তায় নেবে-উৎসব দেখবো তাতে আপত্তি করলে আমার চলে না। বললাম 'খুশি হবো আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলে'।

ভদ্রলোক বোধহয় এটাই চাইছিলেন। গাড়ী অন্যদিকে না ঘুরিয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরে উঁচুতে উঠতে লাগলেন। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি আর পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে আমরা এলাম লুৎসার্ণে।

ইওরোপ ভ্রমণকারীদের স্বপ্ন লুৎসার্ণ। সুইৎসারল্যাণ্ডের সব সৌন্দর্য্য উজার করা আছে লুৎসার্ণে। যতদূর চোখ যায়, ঘাসের সবুজ কার্পেট ঢাকা আস্তরণ নীচের গহ্বর থেকে পাহাড়র ওপর দিয়ে বাক নিয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। আরো নিচে হ্রদ। স্বচ্ছ জল। ছোট ছোট পাল তোলা নৌকা চলেছে। তার পাশ দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা উঠেছে। সব রকম রঙ্ সব রকম বর্ণের অপূর্ব সংমিশ্রন।

ভদ্রলোক গাড়ীর গতি কম করে দিলেন। এবার আমরা উৎরাই' এ নামছি। লুৎসার্ণের কাছ ঘেঁসে আবার আমরা উঠে যাবো এগারোশ মিটার ওপরে।

মোটর চড়াই এর পথে এগিয়ে চলেছে। নীচে খাড়া পাহাড় দেখে মাঝে মাঝে ভয় হয়। তবে সব কিছুর সমাবেশে ভয়ের চেয়ে বেশী জাগছিল বিস্ময়। আল্পস এক পরম বিস্ময়। পথ কখনো খাড়া হয়ে আকাশে হাত বাড়াচ্ছে। আবার কখনো নীচু হতে হতে পাইন গাছের ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘন পাইন গাছের

সারি। কোথাও আলো নেই। আল্পসের গা বেয়ে নাবছে হাজারো ঝর্ণা। উৎরাইতে নাবার সময় মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ করলে ঝর্ণার জলের আওয়াজ ভেসে আসে।

বড় পাহাড়টা পেরিয়ে আমরা যখন পিলাটোসে পৌছুলাম তখন প্রায় তুপুর। গাড়ীর পর গাড়ীর লাইন।

গাড়ী রাখারই জায়গা নেই। ভদ্রলোক আমাদের উৎসবের কাছে একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ী রাখতে গেলেন।

রাস্তা পেরিয়ে খোলা মাঠে আয়োজন হচ্ছে উৎসবের। উৎসবের নাম ইরোড্‌লিং। কাঠের বড় বড় পাইপ নিয়ে সবাই তৈরী হচ্ছে ইয়ডল্‌ করার জন্য। মাঠের মাঝখানে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ কাঠের পাইপ গুলোতে ফু দিয়ে বিভিন্ন পর্দ্দার সুর বার করবার চেষ্টা করছে।

দর্শকরা দাঁড়িয়েছে এদের ঘিরে। মেয়েরা পরেছে সুইৎসার-ল্যাণ্ডের জাতীয় পোশাক। ঝলমলে রোদ আর পোশাকের বাহার মিলিয়ে উৎসবের পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

ডরোথী আর আমি খানিক্ষন বাজনা শুনে আমরা পিলাটোস পাহাড়টায় উঠতে শুরু করলাম। বহু লোক উঠছে পিলাটোস পাহাড়ে। এখানটা থেকে পিলাটোসের চুড়ো পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার হাজার মিটার। যারা পাহাড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের সংখ্যা বেশী। সবাই হাসি মুখে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের চুড়ার দিকে। পাহাড়টা বেশ খাড়া। উঁচু হতে হতে একটা জায়গায় বন জঙ্গল এতো ঘন, কাছের লোক গুলোকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট চেনা যায় না। পিলাটেসের এই অংশটায় পাথরের চেয়ে মাটি বেশী। বৃষ্টি পড়লেই কাদা জমতে থাকে। শুকনো পাতা আর কাদা মিলিয়ে পা পিছলে যাচ্ছে। তবুও সবাই উঠছে পাহাড়ে ওঠার আনন্দে সবাই এগিয়ে চলেছে।

আমরা যখন পিলাটোসের চুড়ায় পৌছুলাম নিচের উৎসবকে মনে

হচ্ছিল যেন কতকগুলো খেলনার পুতুলের সারি। আপনা থেকেই পুতুল গুলো নেচে চলেছে। আমরা শুধু দর্শক মাত্র।

পাহাড়ের খাজে খাজে প্রচুর মেঘ জমেছে। আমাদের স্পর্শ করে উড়ে গেলো এক রাশ সাদা মেঘ। একটা ঠাণ্ডা জলোস্পর্শ। দূর থেকে ভেসে আসা মেঘ আমাদের ছুয়েই আবার আড়াল হয়ে গেলো পাইন গাছ গুলোর ফাকে ফাকে। পেঁজা তুলোর মতো খানিকটা ধোয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে জমে রইল গাছের পাতাগুলোকে জড়িয়ে।

পিলাটোসের চূড়ায় হাওয়ার জন্য বেশীক্ষন বসে থাকা গেলো না। কাঁপুনি আসছিলো।

ডরোথী আর আমি নাবতে শুরু করলাম পাহাড় থেকে। আমরা আবার ফিরে এলাম ইয়ডলিং দেখতে। আমাদের যিনি সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর স্ত্রী ততক্ষনে সুইস পোষাক পরে তৈরী হয়ে বসে আছেন নাচে যোগ দেবার জন্য।

গ্রাম্য নাচের আসর শুরু হলো। সবার পরনে ঘাগরা ধরনের লম্বা পেটিকোট। ঘাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছে, কাজ করা 'এপ্রোনের' মতো। নানা রঙের ওপর সাদা সুতোর সুক্ষ্ম কাজ করা। চুলের বিনুনিতে সাদা ফিতে জড়ানো। নাচের ভঙ্গি' কখনো সবাই গোল হয়ে হাত ধরে আবার কখনো আলাদা আলাদা ব্যক্তিগতো ভাব ভঙ্গির প্রকাশ।

দর্শকদের মধ্যে বেশীর ভাগ, অংশ গ্রহনকারীদের আত্মীয় পরিজন। নাচের ভাব ভঙ্গিতে হাততালিও পড়ছে ঠিক সেরকম ভাবে।

সন্ধ্যে হবার সাথে সাথে ভেঙ্গে গেলো ইয়ডলিং উৎসব। গ্রামের লোক গ্রামে ফিরে যাবে। আমরা নিলাম শহরের পথ।

সারাদিন পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাচ্ছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ফিরে এলাম লুৎসার্ণে। লুৎসার্ণের ইয়ুথ্ হষ্টেলে যখন ঢুকলাম তখন

অনেক রাত হয়ে গেছে। সমস্ত দিন হৈ চৈর মধ্যে কেটির কথা মনে পড়েনি। আগুনের ধারে বসতেই মনে পড়ল কেটির কথা। মাত্র ক'দিনের পরিচয় কেটির সঙ্গে। তবু যেন মনে হচ্ছে ওর অনুপস্থিতিটা অনুভব করছি। বার বার মনে পড়ছে গত দিন কটার কথা। ওর হাসির কথা। কেটি আর জনাথনের মন দেওয়া নেওয়ার কথা। হান্স লুডভিকের কথা। সেদিন লক্ষ্য করছিলাম, হান্সের কথা বলতে গিয়ে কেটি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছিলো। চঞ্চল হয়ে উঠলে ওর চোখের তারা দুটোকে আরো উজ্জ্বল দেখায়।

পরের দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি বলেছিল হান্স সেদিন ডিনার খেতে এসে!

কেটি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল কেন বলবো তোমায়' ?

প্রশ্নটা করে নিজেও অপ্রতিভ বোধ করছিলাম। চাপা দেবার জন্যই বললাম' 'এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম'।

খুশিতে আরো বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কেটি। ও বললো, হান্স বলেছে পুরো চার বছর আমায় না দেখে থাকতে পারবে না। হান্স ঘানায় আসবে ছুটি কাটাতে। হান্স আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ও ঠিক বুঝতে পারছে আমি কি চাই'।

কেটির মুখ থেকে সফলতার রেখাগুলো বেরিরে আসছিলো। গুন গুন করে গান গাইছিলো কেটি।

লুৎসার্ণ থেকে চিঠি লিখলাম কেটিকে।

"এখানে আসার পরে, সারাদিনের হৈচৈর মধ্যে তোমার কথা ততোটা না মনে পড়লেও, সন্ধ্যেবেলা তোমার কথা ভেবে বেশ কিছুটা বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছিলাম। কথা ছিলো তুমিই আগে চিঠি লিখবে। তোমার চিঠির অপেক্ষা না করে তোমাকে লিখতে বসলাম। হয়তো কি মনে করবে জানিনা! ভাবতে পারো 'হোম সিক' হয়ে পড়েছি। তাই তোমার কাছে আবেগ প্রকাশ করতে এই চিঠি লিখছি। না। ঠিক তা নয়। লিখছি আজ একটা কথা মনে করে।

আজ তোমার জন্মদিন। তুমি আমায় জানাও নি। তোমার ঘানা যাবার কাগজ পত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পরছিল এই তারিখটার দিকে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার শুভেচ্ছা ছাড়া দেবার আর বিশেষ কিছুই নেই। হয়ত সেটুকু নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করবে। আজ লুৎসার্ণের কাছে ইয়ডলি উৎসব দেখলাম। দেখতে গিয়েছিলাম তোমার বান্ধবী ডরোথীর সঙ্গে।

জুরিখে, তোমার সঙ্গে যে কটাদিন কাটালাম সে কটা দিন তোমাকে বোঝবার আর তোমাকে জানবার চেষ্টা করছিলাম। বাইরের জগতে বেশী তাকাতে পারিনি। আজ কয়েকদিন পরে হঠাৎ চোখ পড়লো বাইরের দিকে।

ইওরোপ থেকে গ্রীষ্ম প্রায় বিদায় নিচ্ছে। সেই রৌদ্র উজ্জ্বল দিনগুলো শেষ হয়ে আকাশে দেখা যাচ্ছে শুধু কালো কাজল মেঘের নাচন। জানো কেটি, আমাদের দেশেও ঠিক এমনি ঘন ঘটা দেখা যায় আষাঢ় মাসে।' হু হু করে বাতাস বইছিলো। রাস্তায় বেরোলে গায়ে লাগে।

সুইৎসারল্যাণ্ডে এবারের মতো আজই শেষ রাত। স্মৃতি মন্থন করছিলাম গতো কয়েকদিনের। প্রথম দিনেই দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে। সম্পূর্ণ অচেনা ছিলাম তোমার। আজ তোমাকে চিনেছি একথা বলবো না। বলবো তোমায় জেনে ভালো লাগছে।

সেদিন পুরোনো কেল্লাটা দেখাতে দেখাতে আমায় প্রশ্ন করেছিলে তুমি বুঝতেই পারোনা তোমায় কেউ বোঝবার চেষ্টা করে কিনা! সবাইর কথা না হয় বাদ দিলাম। হান্স সম্বন্ধে নিশ্চই এ প্রশ্ন তুলে তোমার পথকে আর জটিল করবে না।

আগামী চারটে বছর তোমার কেটে যাবে কাজের মধ্যে। তোমায় যতোটা বোঝবার চেষ্টা করেছি তার থেকে মনে হয় কাজের প্রেরণার মাঝেই খুঁজে পাবে তোমার আনন্দ। এ চারটে বছরে হয়তো বিরহ থাকবে। থাকবে বেদনা। তবে দেখেনিও আগামী জীবনে সে দিনগুলোই হবে তোমার সবচেয়ে আনন্দের দিন।

কাল চলে যাচ্ছি জার্মানীতে। আবার হয়তো কোন দিন পৃথিবীর কোন প্রান্তে দেখা হয়ে যেতে পারে তোমার সঙ্গে। আমার প্রীতি রইল তোমার জন্য আমার শুভেচ্ছা তোমার সকল কাজের সহায় হোক।" ইতি।

সুইৎসারল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় লেখা চিঠিতে জানিয়ে ছিলাম জর্মানীতে আমার প্রথম ঠিকানা। "উইব্যার কোসফিল্ড"। তুঙ্গার লো প্রবেষ্টিং স্ুদ এর উইব্যার বোসফিল্ডে পৌঁছনোর পর বুঝলাম ঠিকানা শুধু গোটাকয় কথা নয়। সেটা একটা বস্তুও বটে। অবশ্য অর্থ না বোঝার কারণ ছিল ভাষা জ্ঞানের ঘাটতি। সে ঘাটতি বেশীদিন গড়ায় নি। উইব্যার বোসফিল্ড বর্দ্ধিষ্ণু জার্মানীর গণ্ডগ্রাম।

সুইৎসারল্যাণ্ড ছাড়লাম বাসেল থেকে। জার্মান সীমান্তে গাড়ী ঢোকার পরই বুঝতে পারলাম নতুন করে তৎপরতা। 'বুণ্ডেসটাগের' সীমান্ত রক্ষীরা রেলের কামরায় ঢুকে যাত্রীদের সচেতন করে দিলেন 'আপনারা ফেডারেল রিপাবলিক অফ্ জার্মানীতে ঢুকেছেন। আপনাদের অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে'।

স্বাগতম আর অভ্যর্থনাই শেষ কথা নয়। অনুরোধ এলো যার যার পাশপোর্ট আর প্রবেশ পত্র বার করে দেখানোর।

বিদেশ বেড়ানোর হাজারো ঝামেলার মধ্যে এগুলো আবার খুচরো ঝামেলা। কাগজ পত্র পরীক্ষা হয়ে গেলে গাড়ী ছাড়লো ভোর-নাগাদ।

গাড়ী চলেছে জার্মানীর প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল রুঢ় এর মধ্য দিয়ে। রাইন নদীর পাশে পাশে চলেছে জার্মানীর আধুনিক শিল্পাঞ্চল।

জার্মানীকে যারা যুদ্ধের আগে এবং পরে দেখেছেন তারা বলেন যুদ্ধে হাজার ক্ষতির পর একটা উপকার হয়েছে। শহর শিল্পগুলো আধুনিক আর নতুন করে গড়ে উঠেছে। বিশ্বনিন্দুকরা যাই বলুক জায়গাটাকে দেখতে সত্যি অপূর্ব।

বেকারী দুঃখ দারিদ্র্য আর সব শেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস

পেরিয়ে জার্মানী বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে থাকাই নয় গর্বের সঙ্গে বেঁচে আছে। আজ এসেছে প্রাণের জোয়ার।

কায়িক পরিশ্রমে এদের জুড়ি মেলা ভার। শোনা যায় যুদ্ধের পর দেশ গঠনের কাজে দিনে ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টা কাজ করেছে এদের অনেকেই।

আমার গন্তব্য স্থান ছিল 'রাইন' আর রুঢ় পেরিয়ে 'নয়ে ম্যুইনষ্টারে'।

মধ্যাঞ্চলের ছোট শহর 'নয়ে ম্যুইনষ্টারে' পৌছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমাকে নিতে এসেছিল রলফ্। ওর সঙ্গে গিয়ে পৌছলাম তুঙ্গার লো প্রবেষ্টিং সুদে। নয়ে ম্যুইনষ্টার থেকে আরো মাইল পঁচিশেক ভেতরে।

তুঙ্গার লো প্রবেষ্টিং সুদে আমার প্রথম কর্মশিবির। ইওরোপের নানা জায়গা থেকে স্বেচ্ছাশ্রম দানের জন্য বহু ছেলে মেয়েরা এসে একত্রিত হয়েছে। উদ্দেশ্যে মানুষের কল্যাণ। সবাই তরুণ। স্ফুর্ত্তি সবাইর মনে প্রচুর।

কাজ শুরু হলো পরের দিন থেকে। খুব ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাঠে ময়দানে শ্রমদান। খাটুনি বেশী হলেও দিন কয়েক পরে সবাই সামলে উঠলো। তখন আবার অবসর সময়টাকেই বিড়ম্বনা মনে হতো। সবারই সঙ্গে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। ভাবখানা, সবাই আমরা আন্তর্জাতীক পরিবারের সদস্য। নতুন ধরনের জীবন যাত্রার শুরুতে চোখে ধাধা লাগলেও সামলে নিতে বেশী দেরি হয়নি। বিভিন্ন দৃষ্টি আর ভাবধারার সংমিশ্রন হলেও সবারই বয়েস কম থাকাতে একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে সময় লাগেনি।

তুঙ্গার লো প্রবেষ্টিং সুদ শিল্পোন্নত জার্মানীর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রাম বলতে আমাদের দেশের সঙ্গে এইটুকু তফাৎ, বিলিতি গ্রাম। অনেকটা বিলিতি বেগুন আর বেগুনের সঙ্গে তুলনা চলে বৈকি।

ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাবার উপক্রম হতো। আবহাওয়ার দরুন রুচিবোধ আর অভ্যেসগুলোও হয়েছে বিভিন্ন।

সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যেয় আমাদের আড্ডা জমতো 'বিয়ার টুবেতে'। বিয়ার পান করবার আড্ডা। এই আন্তর্জাতীক শিবিরকে কেন্দ্র করে গ্রামের সব বয়েসি ছেলেমেয়েরা এসে ভীড় করতো পাবে তে।

মাঝে মাঝে বিয়ার পান করবার উৎসাহ চরমে উঠলে প্রতিযোগীতা শুরু হতো 'ষ্টিফেল' থেকে বিয়ার পান করবার। রবারের গামবুটের মতো কাঁচের মস্তোবড় জুতো তাকে এখানে বলা হয় 'ষ্টিফেল'। কাঁচের লম্বা জুতোতে ভরতি করা হতো বিয়ার। এবারে প্রতিযোগীতার পালা। ঐ কাঁচের জুতো থেকে চুমুক মেরে বিয়ার পান করতে হবে।

যে ভুলটা সবাই করে, আমারও হয়েছিল তাই। কাঁচের গামবুটের মতো অংশটা ওপর দিকে করে বিয়ার পান করতে গিয়ে বুদবুদ উঠে সব বিয়ার পড়ল আমার মুখে।

পরে অবশ্য মারিয়া আমায় শিখিয়েছিল কি করে ষ্টিফেল থেকে বিয়ার পান করতে হয়। ঐ জুতোর মতো অংশটা থাকতে নিচের দিকে। তাতে বুদবুদ উঠলে ওপরের বিয়ারে চাপ পড়ে না।

একটা ষ্টিফেলে বিয়ার ভর্তি করে নিয়ে গোল হয়ে এক দল ছেলে মেয়েরা বসে। একেকজন খানিকটা করে বিয়ার পান করে ষ্টিফেল এগিয়ে দেয় পরের জনকে। অনেকটা গাঁজার কল্কের মতো।

কিন্তু মুস্কিল বাধবে বিয়ার মুখের ওপর গড়িয়ে পড়লে। বুদবুদ উঠে একঝলক বিয়ার এসে মুখে পড়লে পাশের মেয়েটি উঠে অন্য ছেলের পাশে গিয়ে বসবে। অর্থাৎ বিয়ারটা গড়িয়ে না পড়লে মেয়েটি অভিনন্দন জানাতো চুমু খেয়ে। মেয়েটি অন্যের পাশে গিয়ে বসলে সেই চুমুর অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

প্রথমবারটায় বোকা বনবার পর মারিয়া আমার পাশে বসে হাতে ধরে ষ্টিফেলের বিয়ার খাইয়ে দিয়েছিলো।

মারিয়ার বাবা মিষ্টার ক্রেমার। মিষ্টার ক্রেমারই মারিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামে নানা দেশের লোক এসেছে, মারিয়া তাদের সঙ্গে মিশুক এটা মিষ্টার ক্রেমারের ইচ্ছে।

স্বেচ্ছা শ্রমদানের আন্তর্জাতীক শিবির এ গ্রামে করা হয়েছে অনেকটা মিষ্টার ক্রেমারের উদ্দোগে। সদাশয় লোক। তু তুটো মহাযুদ্ধ দেখেছেন। শুধু দেখেছেন বললে একটু ক্ষুণ্ণ হন। বলতে চান 'দেখেছেন এবং অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছেন'।

সেটা অবশ্য সত্যি কথা। তরুন জার্মান, যুদ্ধের পর অক্ষত অবস্থায় আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না। পূণ্যের জোর আছে বলতে হবে।

কিছুদিন পরে কথা বার্ত্তায় বুঝেছিলাম মিষ্টার ক্রেমারের গায় ক্ষতের দাগ নেই তবে মনের দাগটা আরো গভীর। একটিই মাত্র ছেলে ছিলো। যুদ্ধে মারা গেছে।

ছেলের কথা খুব বেশী একটা বলতে চান না মিষ্টার ক্রেমার। তুঃখ পেয়েছেন তবে তা সবার কাছে জাহির করতে চান না। হয় তো বা লোকের সহানুভূতি কুড়োতে চান না। কখনো বা বলে ফেলেন। সব কিছুরই মুল্য দিতে হয়। এটাও তারই মধ্যে একটা। হাজার হাজার জার্মান ছেলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আর কার কাছে তুঃখ জানাবো'!

উদাস দৃষ্টি নিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হয়ে যান মন খোলা লোকটি।

আর মেয়ে মারিয়া। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে মারিয়া। বুঝতে পারে কঠিন জীবনের মর্ম।

মাঝে মাঝে দাদার কথা বলে। দাদার একটা ছবি রাখে ওয়ালেটের ভেতরকার খাপে।

কয়েকদিন পরে মারিয়ার সঙ্গে আলাপ জমে যাবার পর ওর দাদাকে নিয়ে প্রায়ই কথা হতো।

যুদ্ধ তখন তুমুল ভাবে চলছে। একটার পর একটা খারাপ খবর আসছে। জার্মান সৈন্যরা পেছনে হাটছে। যুদ্ধ শেষ হবার মাসখানেক আগে খবর এলো। মিষ্টার ক্রেমারের ছেলে গোলা-গুলি বিনিময়ের সময় কামানের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

কথাটা আমায় বলতে গিয়ে ঝাপসা হয়ে এলো মারিয়ার চোখ। চোখ দুটো ছলছল করে মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে মারিয়া বললো 'ছোট খবর। টেলিগ্রাম এলো। মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এখনো মাঝে মাঝে বলেন, ব্যথার পরিধিটা এতো বড় হয়তো বা সারাজীবন শোক করলেও তার সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না'।

আবার সামলে নেয় মারিয়া। 'মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা একদম কাঁদেন নি'। পুরো দশ দিন নাকি কোন কথা বলেন নি মিষ্টার ক্রেমার।

'দাদার মুখটা খুব আবছা মনে পড়ে। কেবল মাত্র মনে আছে সে দিনটার কথা। দাদা চলে গেলো একটা স্যুটকেশ নিয়ে। সবাই ষ্টেশনে গিয়েছিলাম দাদাকে ট্রেনে তুলে দিতে। চকোলেটের মেসিন থেকে একটা চকোলেট বার করে আমার হাতে দিয়েছিলো। আর আমার কিছু মনে নেই'।

প্রতি রাতে বিয়ার খেতে খেতে আমার স্মৃতি যেনো হারিয়ে যেতো কোনখানে। অনেক কথা মনে করার চেষ্টা করি। আবছা মনে পড়ে সুতপাকে। কলেজের সামনে গাছটার পেছনে লুকিয়ে থেকে কলেজের গেটটার দিকে একদৃষ্টে তাকালো, কখন সুতপা বেরবে। দু'একবার সিনেমা। আর সাউথ ক্যালকাটা টেনিশের মাঠে বিকেল বেলা গল্প করা। ওই বয়েসটায় বেশ ভালো লাগতো। নিজেকে খুব বড় মনে হতো। আমি চলে এলাম বিদেশে। সুতপা এম. এ. পড়তে ঢুকলো। একটা চিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তার খেই নেই। তবু

ভেবে ভালো লাগে। সেই কটা দিন কোথায় যেনো হারিয়ে যায়। সব গোলমাল হয়ে যায়। এক্ষুনি যে জীবনটা সেটাকে আঁকড়ে বাঁচতে চায় সবাই। অতীতের নিশানা পোঁতা থাকে মনে। বিস্মৃতি যেন তাকে পেরিয়ে দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলে।

একটা সময় আসে যখন ভাবতেও ভালো লাগে না। অবচেতন মন বার বার ছুঁতে চায় সেই পুরোনো জগৎটাকে। চেতন মনে হয়তো তক্ষুনি তার সাড়া মেলে না।

কিছুই ভালো লাগছিলো না। মারিয়াকে বললাম। 'আমায় নাচতে শেখাবে?'

মারিয়া অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'সেকি? তুমি নাচতে জানো না!'

সত্যি কথা বললাম 'দেখো, ভিড়ে দাঁড়িয়ে নাচার ভান করতে পারি। তবে রিদম্ রেখে নাচতে পারি না'।

আমার হাত ধরে উঠে পড়লো মারিয়া। ক্রমাগত বাজনা বেজে চলেছে। জিউক বক্সে যতো রেকর্ড রয়েছে তার চেয়ে পয়সা দিয়ে গান বাজানোর লোকের সংখ্যা বেশী। একটা গান খানিক্ষণ পরে বার বার বেজে চলেছে।

'পপ মিউজিকের' মুস্কিল হলো একটা গান শুনে বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত সবাই একই সঙ্গে শুনতে চায় সে রেকর্ডটা।

বেজে চলেছে একের পর এক রেকর্ড। মারিয়ার কাছেই আমার শেখা, ফক্সট্রট, রাম্বা-সাম্বা, জাইভ আর চা-চা-চা।

নাচতে নাচতে মারিয়া বললো 'প্রথমদিন সবাই যখন নাচছিলো তোমার সঙ্গে নাচবার ইচ্ছে করছিলো। লজ্জায় বলতে পারিনি'।

হেসে বলেছিলাম 'তখন কি আর জানতে যে আমায় নাচ শিখিয়ে তবে নাচতে হবে!'

মারিয়ার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি আর আমার একেবারে ভাঙ্গা জার্মান, দিয়ে ওর সঙ্গে মোটামুটি কথাবার্ত্তা বলতে পারতাম।

মারিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি। তবে বোঝবার চেষ্টা করেছি বললে ভুল হবে।

গ্রামের মেয়ে। পোষাকে আশাকে উগ্রতা নেই। হাঁটু অব্দি নামানো স্কার্ট পরে। স্বভাবের মধ্যে সলজ্জ ভাবটা রয়েছে। ও বুঝতে পারে যৌবনে পা দিয়েছে। কিন্তু বাইরের জগৎকে ভয় করে। চেনা গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াবার মতো বেপরোয়া হতে পারেনি।

কথা বলতে ভালোবাসে। মিশতে চায়। যে বয়েসটায় পড়েছে যখন সব মেয়েরাই চায় কেউ ওর জন্য ভাবুক। দেখে শুনে, কেতাবি প্রেমে পড়তে চায়।

'আমার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক'। আমার কথার জবাবে বলেছিল মারিয়া।

কথা বলতে বলতে মারিয়ার সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছিলাম। প্রাথমিক সৌজন্যতা বোধ ছাড়িয়ে সম্পর্ক তখন হাসি ঠাট্টার চওড়া পর্দায় উঠেছে।

নাচবার সময় মারিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কাকে ভালো লাগে তোমার এ গ্রামের মধ্যে ?'

না বোঝার ভান করে আমার দিকে ও তাকাল। এবার আমি হেসে বললাম 'তোমার সত্যিকারের বয় ফ্রেণ্ড কেউ নেই ?'

ঢিমে তালের সুর বাজছিলো। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গায়ে গা লাগিয়ে নাচছি আমরা। আমার কিছুটা অস্বস্তি বোধ থাকলেও মারিয়ার মোটেই ছিলো না। থাকবার কথাও নয়। আমার অস্বস্তি বোধটা নিতান্তই সংস্কার। একটি ছেলে, মেয়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে নাচলে তাতে অস্বস্তি বোধ করার কি কারণ থাকতে পারে ? এখানে ছেলে মেয়েরা তো এ ভাবেই মেলামেশা করে !

প্রশ্নটা করে নিজের সম্পর্ক নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। প্রথমটায় মনে হলো ও শুনতে পায় নি ! আবারও জিজ্ঞাসা করলাম।

এবারে মারিয়া হেসে দিলো 'সত্যি জানতে চাও ?'

'সত্যি নয় কি মিথ্যে !'

'জেনে তোমার লাভ ?'

লাভ লোকসানের প্রশ্নে আমিই বোধহয় ধরা পড়ে গেলাম। সত্যি তো জেনে আমার লাভ ? আমি এখানে এসেছি আন্তর্জাতিক শিবিরে যোগ দিতে। একুশ দিন থাকবো। তারপর আবার অগুণিত মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাবো। অন্য আর কোথাও শিবির গড়ে তুলবো। 'তুঙ্গারলো প্রবেষ্টিং সুদের মারিয়া স্নাইভারের সত্যিকারের বয় ফ্রেণ্ড কেউ আছে কিনা জেনে আমার লাভ ?

তবু এটাই বোধহয় মানুষের স্বভাব। যে মুহূর্ত্তটা সামনে আছে সেটাই সব চেয়ে মূল্যবান। অতীত তো শেষে হয়ে গেছে! ভবিষ্যৎ, সেতো অজানার গহ্বরে! রয়েছে শুধু বর্ত্তমান। এ মুহূর্ত্তটা দামী। জীবনের সবটুকু বোধ দিয়ে রঙীন করে ধরে রাখার চেষ্টা।

মজা করবার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। মারিয়াকে বললাম 'জেনে আমার লাভ নেই সত্যি তবে তোমার সেই লোকটি, তোমাকে আমাকে এতোক্ষণ নাবতে দেখলে কি ভাবতো তাই ভাবছিলাম।

কথার মোড় বদলে দিয়ে মারিয়া আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো 'তোমাদের দেশে এটা কেমন দেখাতো বলতো !'

প্রথমটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম 'কোনটা ?'

আমার বাঁ হাতে আস্তে করে একটু চাপ দিলো। কাঁধের পেছনে রাখা হাতটা তুলে আমার ঘাড়টা ওর দিকে টেনে মারিয়া বললো এই ধরোনা, একটি বিদেশী ছেলের সঙ্গে তোমাদের দেশের একটি মেয়ে খোলাখুলি ভাবে মিশছে !

প্রশ্ন করে মারিয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম 'দেখো আগের মতো সমাজ ব্যবস্থা ঠিক আজকাল আর নেই। অন্ততঃ গ্রামে না হোক আধুনিক শহর গুলোতে হর হামেশা এমন দুচারটে ব্যাপার হয়েই থাকে।'

পাল্টা প্রশ্ন করবার কেমন যেনো একটা গোঁ চেপে গেলো। জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন তুমি বিদেশী ছেলের সঙ্গে মিশলে কেউ তোমায় কিছু বলবে নাকি?'

মারিয়া যেনো একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলো। 'না ঠিক তা নয়। তবে কি জানো, আজ যদি তুমি শিবির ছাড়া অন্য কোন কাজে একা এই গ্রামে আসতে আর আমি তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতাম, তবে পাড়াপর্শি লোকজন খুব একটা ভালো চোখে দেখতো না।'

লক্ষ্য করছিলাম মারিয়ার সরলতা। একটু দম নিয়ে মরিয়া আবার বললো। 'এক ধরনের মানুষ সব দেশেই একরকম।'

'কি রকম?'

'আমাদের বাবা মা'রাও ছেলে মেয়েদের মেলামেশা নিয়ে মাথা ঘামায়। কোন মেয়ে গায়ে পড়ে বেশি মিশুকে হলে কেউ তাকে রেহাই দেয় না।' খানিকটা ওকে বোঝবার সুরে বললাম 'গ্রামে থাকো বলে এমনটা মনে হয় তোমার। শহরে গেলে দেখবে একেবারে আলাদা।'

কথাটা মারিয়ার বোধহয় পছন্দ হয়েছিল। সায় দিয়ে বললো 'তুমি বোধহয় ঠিকই বলছো।'

আমাদের কথায় বাধা দিলো ন্যান্সি। আমেরিকা থেকে এসেছে এ শিবিরে যোগদিতে। নাচতে নাচতে কখন আমাদের পাশে এসে গেছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ পাশ থেকে ন্যান্সি এসে বললো 'ইউ ড্রিমি আইজ! ঘুমিয়ে পড়ো না যেন মারিয়ার কাঁধে!'

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে একটা অশ্লীল ধরনের ইঙ্গিত করে ন্যান্সি আবার মিশে গেলো নাচের ভীড়ে।

অনেকক্ষণ ধরে নাচছিলাম আমরা দুজনে। শরীরে বেশ একটা আমেজ বোধ করছিলাম।

মারিয়ার দুহাতের মধ্যে আটকে আছি আমি। আমার সমস্ত শীরাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করে উঠছে। রক্তের মধ্যে বোধ করছিলাম আহ্বান! কিসের যেনো একটা আহ্বান!

মারিয়ার যৌবনদ্ধত বুকের কাছে লেপ্টে রয়েছি আমি। উষ্ণ নরম স্পর্শ ক্ষণে ক্ষণে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ। অনেক কিছু ভাবতে চাইছি। ভাবতে পারছি কই! কোনটা স্বাভাবিক? আমার মধ্যে ভাবান্তর ঘটছে কি? কই মারিয়া তো সহজ হয়ে এসেছে! কতো সহজে কথা বলে যাচ্ছে। যেটুকু জড়তা ছিলো সব টুকু কেটে গেছে। আমাকে ও.' বুকের এতো কাছে লেপ্টে রেখে কই ওতো অনুভব করছে না অস্বস্তি?

তবে কি এটা আত্মবিস্মৃতি? না ইউরোপীয় জীবন ধারার সঙ্গে আমার নতুন করে পরিচয়?

আমরা নাচতে নাচতে খানিকটা পাশে সরে এসেছিলাম। মনের ভেতর তুমুল ঝড়। বাইরে খুব বেশী কিছু খেয়াল ছিল না। শুধু বুঝলাম মারিয়া আমার মাথাটাকে দুহাতে নাবিয়ে ওর মুখের ওপর রাখল। আমার ঠোটের ওপর ওর ঠোট রেখে হয়তো বা আবেগ প্রকাশ করতে চাইলো…।

আমরা আবার যখন নাচের আসরে ফিরে গেলাম রাত তখন বারোটা।

এদেশের 'পাব' গুলোর সুবিধে হলো এরা সারারাত খোলা রাখে। তাই তাড়া ছিলোনা শিবিরে ফিরবার।

তাড়াদিলো মারিয়া। এবার ওকে বাড়ী ফিরতে হবে।

অগত্যা ওকে বাড়ী পৌছে দিতে গেলাম। শনিবার সকালে ব্রেকফাষ্টের নেমন্তন্ন হলো মারিয়ার বাড়ীতে।

আমার কঁধের ওপর ওর ডান হাতটা রেখে মারিয়া জানতে চাইলো আগামী শনিবার ব্রেকফাষ্টে আসবো কিনা।

'ফিলেন ডাঙ্কা' বহু ধন্যবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে যখন শিবিরে ফিরলাম অন্যান্য বন্ধুরা তখনও ফেরেনি।

সকালে উঠে আবার সেই গান গাইতে গাইতে ঠাণ্ডার মধ্যে মাঠে যাওয়া। তারপর ট্রাকটরে করে বড় বড় গাছের গুড়ি

গুলোকে একত্র করা। মহাযুদ্ধে বোমার আঘাতে মানুষ মরেছে। তার সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে গাছপালা আর পরিবেশ। বোমার আঘাতে ছড়িয়ে পড়ে আছে গাছের গুড়ি আর নানা অংশ। সে গুলোকে একত্র করে মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দিনের বেলা মাঠ ময়দানের কাজ। আর সন্ধ্যেবেলা হৈ হুল্লোর! সবই দেখতাম অসীম আগ্রহ নিয়ে।

কাজের পর আনন্দ আর আনন্দের পর কাজ। নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। কলের মতো। এমনি নিয়মে বাধা পড়েছিলাম।

কাজ হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো 'তুঙ্গার লো প্রবেষ্টিং স্লুদে'র একুশটা দিন। একুশটা প্রস্তুতির দিন। নিজেকে অন্য সুরে বাধার প্রস্তুতি।

শুক্রবার রাত্রে হঠাৎ খবর এলো আমাকে আগামী কাল হ্যামবুর্গ যেতে হবে।

শনিবার নটা বাজার মিনিট দশেক আগে চলে এলাম মারিয়ার বাড়ীতে।

ঢুকে মারিয়াকে বললাম খবরটা। দুঃখের সঙ্গে জানালাম 'আজ আর ব্রেকফাষ্ট খাওয়া হয়ে উঠবে না মারিয়া।'

দুঃখ পেলো, কিন্তু করার কিছুই ছিলো না। ছোট্ট একটা অনুযোগ করে দুঃখ জানালো।

জিজ্ঞাসা করলাম 'এ অনুযোগ কেন?'

কথার জবাব এড়িয়ে মারিয়া বাড়িয়ে দিলো ছোট ওয়াইনের গ্লাসটা।

মারিয়া আমার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলো 'জানো এর মানে কি?'

'কিসের?'

'এর মানে আমাদের বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হলো। আরো গভীর হোক এই কামনা করছিলাম আমি।'

সঙ্গে দিয়ে দিলো ওর তৈরী করা কেক্ 'রাস্তায় খাবে বুঝলে ?'

ধন্যবাদের পালা সেরে বললাম 'মারিয়া এবার যেতে হবে। তা না হলে দেরী হয়ে যাবে.................।'

কথায় বাধা দিয়ে মারিয়া বললো 'তোমায় কিন্তু ভাইনাক্টে অবশ্যি আসতে হবে।'

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি, ও দাবি করছে। দাবি করছে আমায় বড়দিনে আসতে হবে। ওদের পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য।

যাবো বলে কথা দিয়েছিলাম মারিয়াকে।

বাইরের বাগানের দরজা পর্য্যন্ত এসে ঘুরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি মারিয়ার চোখের কোনায় জল।

মিষ্টার ক্রেমার দাঁড়িয়ে আছেন দূরে। হাত নেড়ে বললেন 'আউফ্ ভিডাজেইন।'

মরিয়ার হাতে আস্তে একটু চাপ দিয়ে বললাম 'আচ্ছা আবার দেখা হবে।'

রুমালে চোখ মুছে মারিয়া বলেছিলো 'আসবে কিন্তু।'

বললাম 'ভিডাজেইন মারিয়া।'

'আউফ্ ভিডাজেইন বিস্ ভাইনাকট্।' আবার দেখা হবে বড়দিনে।

কথাগুলো বেজে চলেছিলো কানের মধ্যে। বড় রাস্তায় এসে গাড়ীতে উঠলাম।

বড় রাস্তায় আমাকে বিদায় দিতে এসেছে ন্যান্সী, কোরিয়া চার্লি আরনেষ্ট আর জুলি।

মোটরটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। ন্যান্সীর চোখ দুটো স্থির হয়েছিলো। গাড়ীতে ওঠার মুখে ও বললো আই উড্ লাইক টু সী ইউ ইন ষ্টেইটস ইন নাইটিন.................।

'ডাঙ্কে সোয়েন' বলে মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কণ্ঠ থেকে জবাব এলো 'বিটে সোয়েন, আউফ্ ভিডাজেইন ডিপি............।

তুঙ্গার-লো প্রবেন্টিং সুদ পেছনে রেখে গাড়ী এগিয়ে চললো জার্মানীর অটো ভান এর দিকে।

গাড়ীতে ষ্টুইবেক আর আমি। ষ্টুইবেকের সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই সামান্য। ষ্টুইবেক আজ হ্যামবুর্গে যাচ্ছিল। আমারও যাবার দরকার সেখানে। যোগাযোগ হয়ে গেলো। ব্যবস্থা সবই রলফ্ ঠিক করে দিয়েছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌছে গেলাম নয়ে ম্যুইনষ্টারে। গাড়ীটা বড় রাস্তা ছেড়ে শহরে ঢোকার পথে খানিক থামলো। একটু জিরিয়ে নেওয়া!

পেছনের গাড়ী দেখার কাঁচের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম গত রোববারের কথা।

ষোলজনের পুরো দলটা মিলে হল্লা করতে করতে নয়ে ম্যুইনষ্টার বেরিয়ে গেলাম। ঠাট্টা ইয়ার্কি আর গানের মধ্যে কেটে গেলো পুরো দিনটা। শহরটা মশগুল করে দিয়েছিলাম। রেষ্টুরেণ্ট গির্জা, বিয়ার ষ্টুবে কিছুই বাদ যায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে গির্জার সবচেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল ন্যান্সী আর চার্লি।

অনেকক্ষণ ওদের খোঁজ না পেয়ে সবাই একটু বিরক্ত হচ্ছিল। ন্যান্সী যখন নেবে এলো, ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঘানার ছেলে আর্নেষ্টকে 'কি ব্যাপার ন্যান্সীকে এতো লাল দেখাচ্ছে কেন?'

বুঝতে পারিনি। আর্নেষ্ট আগে থাকতেই চাইছিল। পাল্টে জবাব দিলো। 'তবে কি তোমার আর আমার মতো বেগুনি হবে?'

কথাটা ঠিকই। মেমসাহেবরা লজ্জার আভাসে লাল হয়ে ওঠে। আর্নেষ্টের বিরক্তির কারণ বুঝেছিলাম শিবিরে ফিরে আসার পর।

খাবার আগে হঠাৎ আর্নেষ্ট জানিয়ে দিলো 'খেয়ে দেয়ে কেউ সঙ্গে সঙ্গে বিয়ার খেতে যাবে না। মিটিং হবে।'

আর্নেষ্ট শিবিরের নেতা, তাই অনিচ্ছা থাকলেও সবাইকে মানতে হবে।

খুব ছোট্ট মিটিং। আর্নেষ্টের বক্তব্য আমরা বাইরে গিয়ে বড্ড ছেলেমানুষি করি। তাই এবার থেকে সবাইকে দলবদ্ধ ভাবে যাতায়াত করতে হবে।

কথা বলার সময় আর্নেষ্টের চোখ ন্যান্সীর দিকে ফেরানো ছিলো। কোথায় যেন একটা হতাশার ছাপ পড়েছে আর্নেষ্টের দৃষ্টিতে।

'পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি লম্বা উনিশ বছরের ন্যান্সীর প্রতি আর্নেষ্ট যে একটু ঝুকেছিল এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম। তবে ন্যান্সী চার্লির সঙ্গে হারিয়ে যাবার পরে এ ব্যাপারটায় আর্নেষ্ট রেগে যাবে, ঠিক আগে থেকে ভাবা যায়নি।

ন্যান্সী আবার এতো রাখা ঢাকা টুকটাক প্রেম নিয়ে মাথা ঘামাতো না। ন্যান্সীকে ওর দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিধির কথা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত 'ছত্রিশ, একুশ পঁয়ত্রিশ।' তারপর হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি।

বেশবাস তেমনি হালকা পরতো। ব্লাউজ আর জিনস্। ব্লাউজের ওপরের তিনটে বোতাম ন্যান্সী লাগাতো না কিম্বা ভুলে যেতো। সাহস করে কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি। তবে নজর ত্থচার বার দেয়নি একথা বলবো না। সবকিছু সত্বেও ন্যান্সীকে সবাইর ভালো লাগতো। ওর সোজাসুজি ব্যবহার সবাই পছন্দ করতো।

অন্যেরা মজা পেত আর্নেষ্টের ঘুরঘুরে স্বভাব দেখে। আর্নেষ্ট চাইতো ন্যান্সীকে আগলে রাখতে। আর ন্যান্সী যেন ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিচ্ছে না। এমনি একটা ভাব।

চার্লি হাসতো। হয়তো সে হাসিতে যোগ দিতো ন্যান্সীও।

তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম গত কয়েকটা দিনের কথা। ভাবনার গতি বাধা পেলো ষ্টুইবেকের ডাকে।

'এবারে গাড়ী ছাড়বে। জল তেল সব ঠিক আছে।' ষ্টুইবেক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো 'আমার আর কিছু দরকার আছে কিনা?'

ছোট রাস্তা থেকে গাড়ী আবার উঠে এলো অটো ভানে।

জার্মানীর অটোভান বা মহাপথ যাই বলা যাক না কেন বহু গল্প-গাঁথা জড়িত এর সঙ্গে। কেউ বলে রাস্তায় বালি পড়ে থাকলে পর্য্যন্ত গাড়ীতে বসে টের পাওয়া যায়। এতো মসৃন রাস্তা।

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে সারা দেশে বেকারী আর দারিদ্রতা। দেশের পুরো চেহারা বদলে দেবার কথা চিন্তা করছিলেন হিটলার। সরকারী টাকা বিনিয়োগ করে, তৈরী শুরু হলো অটো-ভান। মোটর পথে সহজে এক শহর থেকে অন্য শহরের এমনকি গ্রাম থেকে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করলো।

কেউ আবার বলেন অটোভান তৈরী হয়েছিলো তাড়াতাড়ি সৈন্য যাওয়া আসা আর যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যাতায়াতের সুবিধের জন্য।

যে কারণেই তৈরী হোক অটোভান, আজকের জার্মানীকে দিচ্ছে গতি আর স্বাচ্ছন্দ্য।

গাড়ী চলছিলো ঘণ্টায় দেড়শ কিলোমিটারে। অটোভানে গাড়ী একবার চললে তার গতি বোঝা ভার। যেন সহজে সাবলীল গতিতে একটা যন্ত্র এগিয়ে চলেছে।

ঘণ্টা দুই বাদে আমরা পৌছে গেলাম ব্রেমেনে। জার্মানীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর।

শহরে ঢোকার পর সেই এক ভাব। বহুলোকের ভিড়। নানা দেশের লোক। সব দেশের শহরগুলো বোধহয় একই রকম। বৈচিত্রের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

জাহাজ ঘাট পেরিয়ে আমরা আবার উঠে এলাম মহাপথে।

রাস্তার মোড়েই লেখা হ্যামবুর্গ একশ ত্রিশ কিলোমিটার আর বার্লিন তিনশ বিশ কিলোমিটার।

কোলকাতায় কলেজে যাবার পথে যে অভ্যেসটা রপ্ত করেছিলাম সেটা দেখছি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। সমান তালে গাড়ী চলার সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। টেরই পাইনি কতোটা পথ এলাম আর কোথায় এলাম।

শহরের কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে গেলো ' বেলা তখন আড়াইটে। শনিবারের বিকেল। বহু লোকজন তাড়াহুড়ো করে বাজার হাট সারছে। প্রথমটায় বুঝতে না পেরে ষ্টুইবেককে জিজ্ঞাসা করলাম 'কোথায় এলাম বলো তো।'

ষ্টুইবেক ঘাড় না ঘুরিয়ে ষ্টীয়ারিং এ হাত রেখে জানালো আমরা হ্যামবুর্গ পৌছে গেছি।

খানিকটা স্বপ্ন দেখার পর জেগে ওঠার মতোই নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম। বুঝতে পারিনি এতো শিগ্‌গির পৌছে যাবো হ্যামবুর্গে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে ষ্টুইবেককে বললাম কিছু মনে করোনা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ষ্টুইবেক এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'নেভার মাইণ্ড। আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌছে যাবো তোমার ঠিকানায়'।

মস্তো শহর হ্যামবুর্গ। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর সব চাইতে বড় শহর আর বন্দর। সব দেশের লোক আসে হ্যামবুর্গে। ভালবাসায় না হোক কাজে আসে। আসে জাহাজ নিয়ে। সব রকম জাহাজ এসে ভেড়ে হ্যামবুর্গের বন্দরে। জাহাজীদের সঙ্গে তাদের স্বভাবটাও আসে হ্যামবুর্গের আনন্দ তুলে নিতে।

আধুনিক শহর হ্যামবুর্গ। আমোদ বিলোনোর ব্যবস্থা রয়েছে। শহর জুড়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন প্যারিস হলিউডের পরেই হলো হ্যামবুর্গের ঠাঁই। সব ধরনের মানুষের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে

হ্যামবুর্গে। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। হ্যামবুর্গ 'মজার কুঠি।'

গাড়ী এসে দাঁড়ালো একশো বারো নম্বর বিম ষ্ট্রাসের সামনে। বিরাট চওড়া রাস্তা। অজস্র লোকের ভিড়। রাস্তার উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে হ্যামবুর্গ পুলিশের একুশ তলা বাড়ীটাকে।

ষ্টুইবেক গাড়ীর দরজা খুলে দিলো। ব্যগ আর স্যুটকেস হাতে নিয়ে নেবে এলাম গাড়ী থেকে।

বিম ষ্ট্রাসের বাড়ীর পাঁচতলার বেল টিপতে গিয়ে চোখে পড়ল, লেখা রয়েছে 'প্লিজ ওয়েট টিল ফোর'ও ক্লক—রোজবিতা।' আমারই উদ্দেশ্যে লেখা।

ষ্টুইবেককে আর দেরি করানো উচিত মনে হলো না। জিনিষ পত্র নিয়ে এসে রেখে দিলাম ফুট পাথের ধারে। ধন্যবাদের পালা সেরে ষ্টুইবকের গাড়ী আস্তে আস্তে হারিয়ে গেলো লুইবেকের রাস্তায়।

যতোদূর চোখ যায় চেনা আর কিছুই নেই। কোথাও কোন মুখ দেখে মনে হয় না একে আগে কোথাও দেখেছি।

বিম ষ্ট্রাউসের বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে অজানা ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ কানে এলো স্পষ্ট ইংরেজীতে কে যেনো বলছে 'তুমি কি ভারত থেকে আসছো?'

পেছন ফিরতেই যার দিকে চোখ পরলো তার বয়েস মনে হোল পঞ্চাশের কোঠায়। যে ভাবে অমোর দিকে তাকিয়ে আছেন বুঝলাম ইনিই প্রশ্ন কর্তা।

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে জবাব দিলাম 'আপনার অনুমান ঠিকই। আমি ভারত থেকে আসছি।'

আলাপি লোক। তুচার কথাতেই আলাপ জমিয়ে দিলেন। ওনার আমদানি রপ্তানীর ব্যবসা। হ্যামবুর্গে আপিস। কোলকাতার তুএকটি কোম্পানীর নাম করলেন যাদের সঙ্গে কাজ কারবার করে থাকেন। বহুদিনের ইচ্ছে ভারতে যাবার তবে সে আর হয়ে উঠছে না।

কথা বেশ গড়াচ্ছিল কিন্তু শুনতে পেলাম কে যেনো ডাকছেন ভদ্রলোককে। 'বিটে, কামান্ স্মেল।'

রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম গাড়ীর দরজা খুলে অপেক্ষা করছেন এক ভদ্রমহিলা।

ভদ্রলোক ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন 'মাই ওয়াইফ। তাড়া দিচ্ছে গাড়ীতে ওঠার জন্য। তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল।' আর কিছু বলার ইচ্ছে থাকলেও ভদ্রলোকের সুযোগ ছিল না। গাড়ীতে চাপতেই গাড়ী ছেড়ে দিলো।

মন্দ লাগছিলো না সঙ্গী পেয়ে কথাবার্তায় কেটে যাচ্ছিল সময়। কপাল খারাপ কি করা যাবে।

রাস্তার লোক গুনছি। দিনটা বেশ সুন্দর হয়েছে আজ।

ঠাণ্ডা আছে আবার ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে। নতুন নতুন মানুষের হাবভাব দেখে অবাক হচ্ছিলাম।

সামনে আসছে দুটি মেয়ে আর সঙ্গে একটি ছেলে। ছেলেটির বিরাট শরীর। একটি মেয়ে মাঝ বয়েসি অন্য মেয়েটিকে মনে হচ্ছে এখনো স্কুল কলেজে যায়। মাঝ বয়েসি যে, তাকে মেয়ে বলবো কি ভদ্রমহিলা বলবো ভাবছিলাম। কম বয়েসি মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ চটপটে। অনর্গল কথা বলে চলেছে। ভাবছি এদের সম্বন্ধটা কি হতে পারে!

ভদ্র মহিলা আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন......।

হঠাৎ যেনো জেগে উঠলাম। ততক্ষণে আমার ও হাত এগিয়ে গেছে করমর্দন করার জন্য।

'রোজবিতা ইজ মাই নেইম। আর আমি নিশ্চিত তোমার নাম ..........। জিনিষ পত্র নিয়ে তোমারই এখানে অপেক্ষা করার কথা।'

বললাম 'আপনার কোন ভুল হয়নি আমিই..................।

রোজবিতা আলাপ করিয়ে দিলো এলিজাবেথ আর গেরো বস্কের সঙ্গে।

পরিচয়ের পালা শেষ করে আমরা সবাই মিলে ওপরে উঠে গেলাম জিনিষ পত্র রাখতে।

আন্তর্জাতিক সেচ্ছাসেবা কেন্দ্রের এটাই হলো হ্যামবুর্গ শাখার আপিস। কথায় কথায় জানতে পারলাম এটা জার্মানীরও প্রধান দপ্তর।

রোজবিতা জানালো এখানে আমরা আবার একটু পরে ঘুরে আসবো। তারপর গোরা বস্কের সঙ্গে যাবো হ্যামবুর্গে সামান্য বাইরে একটা কর্ম শিবিরে।

'তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?' রোজবিতা প্রশ্ন করলো।

বললাম 'সকালে ব্রেকফাষ্ট করেছি। রাস্তায় আসতে আসতে কফি খেয়েছি।

মারিয়ার দেওয়া কেকে'র কথা বলতে গিয়ে বলতে পারলাম না। ওটা তখনো আমার ব্যাগে রয়েছে।

আমার কথা শুনে রোজবিতা বললো, তাহ'লে আরো কিছুক্ষণ কাটাতে পারবে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম রোজবিতার মুখের দিকে। ক্ষিদে পেলেও মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

'চলো এখন আমরা শহর দেখতে বেরবো'।

এখানে আর দ্বিরুক্তি চলে না। আপাততঃ রোজবিতার হেপাজাতে থাকছি।

খানিকটা ঠাট্টা করেই বললাম, 'না তাতে কিছু নেই। শুধু বেশী ক্ষিদে পেলে আমায় শীত করতে থাকে!' রোজবিতা খুব একটা ভ্রুক্ষেপ করলো বলে বোধ হলো না।

আপিস বন্ধ করে আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পরলাম শহর দেখতে।

রোজবিতা মোটামুটি ইংরেজী বলতে পারে। গেরো আর এলিজাবেথ বুঝতে চেষ্টা করে রোজবিতা আর আমার কথাবার্তা।

ওদের জন্য আবার কথার সারমর্ম জার্মান ভাষায় ধরিয়ে দিতে হচ্ছে।

বেশ খানিকটা ঘুরে আমরা চা খেতে গেলাম রোজবিতার বাড়ীতে।

বুড়ি মা। আমাদের দেখে খুশি হলেন। মা আর মেয়ে থাকে হু কামরার এই ফ্ল্যাটটাতে। মেয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে বুড়ি সব চাইতে খুশি তাতে। বার বার করে বলছিলেন আমাদের।

রোজবিতা জার্মান ইহুদি! যুদ্ধের আগে ওর বাবার অনেক-গুলো ব্যবসা ছিল।

স্বামী স্ত্রী আর মেয়ে। সংসার বেশ সুন্দর চলছিল।

তারপর নিমেষে সে দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেলো। সব কিছু তোলপাড় হয়ে আর কিছুই রইল না।

সমস্ত জার্মানী জুড়ে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। দেশের ভেতরে গুপ্তহত্যা খুন খারাপির খবর পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু তার প্রবলতা সবাই আচ করতে পারেনি।

একদিন সকালবেলা কারা যেন ডাকতে এসেছিল রোজবিতার বাবাকে। সেই যে বাড়ী থেকে বেরোলেন আর ফিরে আসেন নি তিনি।

হতাশা আর ভয়ে রোজবিতা আর ওর মা দেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হল। মা আর মেয়ে হুজনেই ভাবছিল, রোজবিতার বাবাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়। ওরা অনেক আশা নিয়ে ফিরে এসেছিল হ্যামবুর্গে। বহু চেষ্টা হয়েছিল খুঁজে বার করবার। যে দিনটায় রোজবিতার বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাড়ী থেকে, পুলিশের কাগজ পত্রে তার হদিশ পাওয়া গেলো। কিন্তু তারপর কি হয়েছে কেউ জানে না।

বলছিলেন রোজবিতার মা। ভদ্র মহিলা এখনো বুক বেঁধে আছেন যদি কোনদিন ফিরে আসেন রোজবিতার বাবা।

মায়ের কথা শুনে রোজবিতা হাসে। রোজবিতা বিশ্বাস করেনা ওর বাবা বেঁচে আছেন। মাঝে মাঝে মা যখন শোকে ভেঙ্গে পড়েন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

রোজবিতা বললো 'পুরোনো দিনের কথা বলতে গেলেই বার বার বাবার কথা বলে ফেলেন।'

কথা চাপা দেবার জন্য আমি বললাম 'আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে বলেছিলে, চলো এবারে যাওয়া যাক।'

চা পর্ব শেষ করে আমরা সবাই বেড়াতে গেলাম 'ব্লেঞ্চানিজে'। এলবে নদীর ধার দিয়ে ক্রমাগত যে উপকূল ভূমি চলে গেছে পূর্ব সাগর পর্যন্ত তাকেই বলা হয় ব্লেঞ্চানিজ। অপূর্ব লাগছিলো। নদীর কলস্রোত আর সন্ধ্যেবেলার সূর্য্য ডোবার রঙে মিলে নদীর ওপার-টাকে মনে হচ্ছিল অন্য একটা পৃথিবী। সে দিকটা চেনা জানা জগতের বাইরে। দুঃখ বিষাদ আর হতাশা হয়তো বা পৌঁছয়নি সেখানে।

নানা জাহাজের ভিড় হয়েছে বন্দরে। শতুয়েক গজ দূরে জাহাজ তৈরার আর মেরামতের কারখানা থেকে নদীর বুকে ফেলা হয়েছে বড় বড় আলোর নিশানা।

চুপ চাপ বসে ছিলাম নদীর ধারের ঢাকা বেঞ্চটাতে।

মনে পড়ছিলো আউট্রাম ঘাটের ভাসমান 'বুফে' রেষ্টুরেণ্টটার কথা। গঙ্গার ধারে জহোজের ওপর রেষ্টুরেণ্টে। মাঝে মাঝে সেই কোনের টেবিলটাতে গিয়ে একা বসে থাকতাম। নিদেন পক্ষে ছুটির দিন হলে আমার সঙ্গে থাকতো আমার বন্ধু অনিল। ঢেউ গুনতাম গঙ্গার। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মনে লাগতো দোলা। বার বার মনে হোতো কবে ভেসে যাবো ঐ জাহাজ গুলোর মতো। কবে আমি হারিয়ে যাবো মহাসাগরের ঢেউয়ের মাঝে। বিলেত যাবার মোহের চেয়ে চেনা জগত থেকে হারিয়ে যাওয়ার নেশাইটাই হয়তো বেশী বোধ করতাম। গঙ্গার ঢেউ দোলা দিতো মনে।

প্রতিবারে যখনই গঙ্গাকে দেখেছি সাগর দ্বীপ থেকে, দক্ষিনেশ্বর থেকে, কানপুর থেকে কিম্বা হৃষিকেশ হরিদ্বার থেকে প্রতিবারে বিচিত্ররূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছে গঙ্গা। বার বার আকর্ষণ করেছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে। আমাকে ডেকেছে। আমাকে হাতছানি দিয়েছে। গঙ্গা আমার অজানা জগতের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম সোপান।

সেই জার্মান গানটা কে লিখেছিলো মনে নেই 'কালকুট্টা লিগ্ট আন গাঙ্গেস'। গঙ্গায় পাড়ে রয়েছে কোলকাতা। বার বার শুনেছি এ গানটা। যখনই শুনি আমার মনকে টেনে নেয় গঙ্গা। হাজার হাজার মাইল দূরে আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করি গঙ্গাকে আর তার পারের মানুষকে। কাঙাল করে তোলে মনটাকে। সেই স্পর্শ সেই অনুভূতির সামান্য ছোঁয়া পাবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গোনে আমার মন।

রোজবিতার বাড়ী যখন ছাড়লাম রাত তখন সাড়ে এগারোটা। গেরো আর আমি। হ্যামবুর্গের তখন কিছুই জানিনা। কিছুই চিনিনা। গেরোর সঙ্গে নেবে গেলাম মাটির নীচের রেল ষ্টেশনে। 'উ-বান' মাটির নীচে রেলপথ। আঁকা বাঁকা পথে আর কোথায় গাড়ী বদল করলাম প্রথম দিনে আমার পক্ষে সম্ভব ছিলোনা তার হিসেব রাখার।

শিবিরে পৌছে হাত ঘড়ির দিকে তাকাতে বুঝলাম রাত একটা বেজেছে।

জার্মানীর কর্ম শিবিরের এটা দ্বিতীয়। একটা বিরাট বাড়ী। ঠিক বাড়ী বলা উচিত নয় বলা যায় ক্যাসেল। কোন আমলে হয় তো জার্মান ব্যরণ কিম্বা নাইটরা থাকতো এর সবটা জুড়ে।

বর্ত্তমানে পূর্ব্ব জার্মানী আর পোল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুত্যাগীদের আস্তানা।

পেল্লাই সাইজের লম্বা ঘরটার দেয়ালের দিকে আমাদের জন্য ছুটো খাট রাখাছিল।

ছু চারটে বিছানায়, মনে হলো লোকজন ঘুমুচ্ছে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গলো গেরোর ডাকে।

'বারোটা বেজে গেছে। উঠে পড়ো।'

হকচকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ততক্ষণে নীচে রোজবিতা এসে গেছে।

রোজবিতা আমাদের সবাইকে ব্রেকফাষ্ট তৈরী করে দিলো। প্রায় জনা বিশেক ছেলে মেয়ে এসে গেছে এরই মধ্যে। আরো চার ছজন আজই এসে পড়বে। কাল থেকে পুরোদমে শিবিরের কাজ সুরু।

ব্রেকফাষ্টের পর বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

দোতলার অন্দর মহলে স্থান হয়েছে আমাদের। লম্বা ফুটবল মাঠের মতো ঘরটায় আমাদের শোবার জায়গা! টুকরো কাঠের লম্বকরা পাটাতন। দেয়ালোর কাঠের ওপর কাজ করা। ভার্নিস পড়েনি অনেকদিন। তবে এককালে যে পড়তো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভাবলে অবাক লাগে এতো বড়ো ঘরটাতে কি হতো?

ইতিহাস খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে লর্ড ব্যরণ অথবা নাইটদের এটা ছিলো ডাইনিং রুম। কিম্বা সাজকক্ষ। সে ছিলো সোনা দানার দিন। সাদা ঘোড়ায় চড়ে নাইটরা আসতো নেমন্তন্ন রাখতে। অন্ততঃ বাইরেটা দেখলে তাই মনে হয়। এখন যেখানটা মোটর পার্কিংএর জায়গা সেটাই ব্যবহার হতো ঘোড়া বেঁধে রাখার জন্য।

সে সোনা দানার দিন আর নেই। শোনা যায়না নাইট ব্যরনদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

সে আওয়াজ অন্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আজ সেটা আওয়াজ নয়। সেটা আর্ত্তনাদ। গৃহহীন বাস্তুহীন মানুষগুলোর আর্ত্তনাদ।

দিনের বেলা শুনলে মনে হবে আর্ত্তনাদ। আর রাত্তিরে গোঙানী। বড় বড় কামরাগুলোকে ভাগ করে ছোট খুপরীর মতো করে দেওয়া হয়েছে। সেই খুপরীতে শুয়ে পাশ ফিরতে যখন একে অন্যের গায়ের ওপর অসাবধানে হাত পা রাখে কেমন যেনো একটা গোঙানীর আওয়াজ বেরিয়ে আসে। তারই মধ্যে কেউ স্বপ্ন দেখছে পোল্যাণ্ডের নিজের ফেলে আসা ছোট্ট দোতালা বাড়ীটার। আবার কেউ বা স্বপ্ন দেখে ভয়ে গুঙিয়ে উঠছে। পূর্ব জার্মানীর সেই খামার বাড়ীটার ওপর বোমা পড়লো। সব দাউ দাউ করে জ্বলছে। অসহায় চোখে শুধু দূর থেকে তাকিয়ে থাকো!

একটার পর একটা ঘর দেখছিলাম। সারা বাড়ীটার কোথাও আর এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। সব ভরতি।

জার্মানীতে কাজ রয়েছে সবার জন্য হাজার লক্ষ লোক আসুক যে কোন একটা কাজ হয়ে যাবে। তবে থাকার জায়গা নেই। কোথায় থাকবে? একে নিজের দেশের লোকেরই থাকার জায়গা নেই। তাতেই আবার বাস্তুত্যাগীরা।

বাসস্থানের অভাবে কোনক্রমে কোথাও একটা রাত গুজরান করা। এ বাড়ীটাতে বটেই। প্রতি শহরে প্রতি স্তরে তার চিহ্ন ফুটে বেরোচ্ছে।

স্নানের জায়গা বলে নির্দ্দিষ্ট কিছু নেই। শালীনতার ওপর একটু জোর পড়বে এ আর বেশী কথা কি!

অবশ্য ভেবে দেখলে মনে হয় এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কোন দেশে বাস্তুত্যাগীদের জন্যে করা হয়েছিল? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। তবু এরা খেয়ে পরে আছে।

'দুর্ভোগ যাদের কপালে লেখা আছে তারা এর চেয়ে আর কি ভালো ভাবে বাঁচবে বলো?' আমায় বলছিলো পোলেশ বুড়ো ভ্রুবনস্কি।

'রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেলো দেশটার ওপর দিয়ে। কোথা

থেকে ঐ একটা ঝড়ে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেলো। দেখলাম অনেকে পালাচ্ছে পোল্যাণ্ড ছেড়ে। লোককে পালাতে দেখে ভয় আরো বেড়ে গেলো সবাইর। আমরাও বহু ঝড় সহ্য করে পালিয়ে এলাম।'

বুড়ো ড্রবনস্কি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে প্রক মুখ ধোয়া ছাড়লো। হয়তো বা ধোয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এলো চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা।

'বহু বছর হয়ে গেলো এখানে রয়েছি। হয়তো বা পোল্যাণ্ডে অনেক ঘটে গেছে এর মধ্যে। খবর রাখতে পারিনি।'

প্রশ্ন করলাম 'ইচ্ছে করেনা আপনার পোল্যাণ্ডে ফিরে যেতে?'

'মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে দেশে ফিরে যেতে। কিন্তু সাহস পাইনা।'

ড্রবনস্কিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম 'বিশ্বের সব বাস্তুত্যাগী এভাবে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। মূল থেকে সরে এসে অবোর তারা নতুন করে জীবন গড়ছে। নতুন শেকর হয়তো বেরুবে। আবার একেকটা নতুন জাতি গড়ে উঠবে এ ভাবে।'

মনে হচ্ছিল কথাগুলো যেনো নিজেকেই আশ্বস্ত করতে চাইছিলাম।

বেশ খানিক্ষণ পরে লাউঞ্জে ফিরে এসে দেখলাম ততক্ষণে সবাই তৈরী হয়ে নীচে নেবে এসেছে। শহর দেখতে বেরুবে।

আমাদের হ্যামবুর্গ দেখাচ্ছিলো কারীন। ষ্টুট গার্ট থেকে এসেছে। শ্রমদান শিবিরে যোগ দিতে এসেছে।

কারীন বলছিলো এবারটা নিয়ে ও আটবার এলো হ্যামবুর্গে। হ্যামবুর্গের মতো নাকি আর কোন শহর নেই জার্মানীতে। ওর সব চাইতে ভালো লাগে।

মহাযুদ্ধে প্রায় গোটা শহরটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি। হাল ফ্যাশনের বাড়ীঘর। আকাশ ছোয়া নতুন ধরনের বাড়ীঘর।

কারীন বলছিলো 'আগে 'আগেকার হ্যামবুর্গের সঙ্গে মিল খুবই কম।'

কলকারখানা আর ব্যবসা বানিজ্য সবই গিয়েছিল। সেগুলো আবার নতুন করে শুরু হয়েছে।

'তবে তফাৎ একটু আছে।' আরো কি যেন বলার ইচ্ছেছিল কারীনের। শেষ না করে, থেমে গেল

কারীনের কথা না বুঝতে পেরে, পালটা প্রশ্ন করলাম।

'খুব বেশী কিছু না' আগে সব কিছুর মধ্যে ছিল জার্মানীর একটা নিজস্ব প্রতিফলন। এখন সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। বেশীর। ভাগ জিনিষেই রয়েছে মার্কিণ, ইংরেজ ফরাসী আর সঙ্গে জার্মান ভাবধারা মিলিয়ে একটা নতুন সভ্যতা।'

খানিকটা থেমে কারীন বললো 'ভালো কি খারাপ, মুল্য বিচার করা নয়। পরিবর্ত্তন। এটাই আমাদের চোখে পরে।'

যুদ্ধের দাগ মুছে যাচ্ছে শহর নগর গ্রাম বন্দরের ওপর থেকে। তবে খানিক ঘসলে বোধহয় সেই পুরোনো ঘা বেরিয়ে আসে।

কারীনকে আর প্রশ্ন জালে ব্যতিব্যস্ত করে লাভ নেই। তাই চুপ করেই রইলাম।

আমরা সবাই মিলে চলে এলাম এলবে'র ধারে। গতকাল প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েছিলাম এলবে'র।

একে রোববার তাতে আজ বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। লোকজনের ভিড় বড় একটা নেই।

বোটে করে নদীতে বেড়াবার শখ হল সবারই। স্রোত নেই। জলের রঙ ঘোলাটে। বেশীদূর চোখ যায়না! কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। জাহাজ সারানোর কারখানার গাদা বোটগুলো পেরিয়ে আসতে চোখে পড়ল বন্দরের এক কোনে একটা জাহাজের দিকে। জাহাজের নাম 'ইণ্ডিয়ান ট্রাষ্ট'। আর তার নীচে লেখা রয়েছে 'ক্যালকাটা'।

শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। সমস্ত অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে গেল 'কোলকাতা'।

কতদিন ছেড়ে এসেছি দেশ। কত পেছনে ফেলে এসেছি। কতদূরে সে দেশ। কত সাগর কত নদী পেরিয়ে যেতে হয় কোলকাতা।

পেছন থেকে গেরো আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল আমাকে। আমরা এসে গেছি মাটির নীচের রেল পথের ষ্টেশনে।

সন্ধ্যে আটটায় আমরা ফিরে এলাম বারসবুইটেলের শিবিরে। কাল থেকে আবার পুরোদমে কাজ শুরু।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর রোজবিতা সবাইকে ডেকে পাঠালো। মিটিং হবে।

মিটিং-এ ঠিক হ'ল কে কি কাজ করবে।

সবাই এক জায়গায় কাজ করবে না। বারসবুইটেলের শিবির হবে আমাদের থাকার জায়গা। আর সন্ধ্যেবেলা আলোচনা এবং মিটিং-এর জায়গা।

গেরো, ডোনিস, এলিজাবেথ, মুল্যার বুড়ো আর আমি কাজ করবো একসঙ্গে। আমাদের জন্য কাজের জায়গা ঠিক হয়েছে 'ওল্ড পিপিলস হোমে'।

'ওল্ড পিপিলস হোম' পশ্চিমী সমাজ ব্যবস্থার আশীর্বাদ। দিন কয়েক ওখানে কাটিয়ে মনে হয়েছিল 'ওল্ড পিপিলস হোম' পশ্চিমী সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ।

সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজে বোঝার চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারিনি।

হাজার খানেক বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা রয়েছেন। কেউ কেউ অসহায়। আর বেশীর ভাগই পঙ্গু। আবার কারু হাত বা পা নেই। সঙ্গে বেশ কিছু বিকৃত মস্তিষ্কের লোক রয়েছে।

এদের হোমে আসার ইতিহাস একেক জনের একেক রকম। বিচিত্র সব কাহিনী।

ড্রুগ্যারের সঙ্গে পরিচয় হতে বেশী সময় লাগেনি।

খানিকটা সান্ত্বনা সহানুভূতি আর বেশীর ভাগটাই সেবা দিয়ে ড্রুগ্যারের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল।

আর সবাইর মতো ড্রুগ্যার গিয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধে মারা পরেনি তবে বন্দী হয়েছিল।

তখনো ড্রুগ্যার মুক্তি পায়নি। রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে কাটাচ্ছিল বন্দী জীবন। বন্দী হবার পর থেকে কোন খবর পায়নি স্ত্রী আর ছেলের। একটিই ছেলে।

একদিন সকালে শুনতে পেয়েছিল যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যে দিনটায় খবর এলো, সে দিন ড্রুগ্যার ছিল হাঁসপাতালে। ওর বাঁ পাটা কেটে বাদ দেওয়া হলো সেদিন।

ড্রুগ্যারের ধরা পরার ইতিহাদ আরো করুণ। সামনা সামনি যুদ্ধে পুরো ব্যাটিলিয়ান প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখে আপশোষে কোনরকমে পালিয়ে যাচ্ছিল বার্লিন থেকে। রাস্তা পেরুবার চেষ্টা করতেই শত্রু পক্ষের গুলি পরতে শুরু করলো। ছোটবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শত্রু পক্ষের সামরিক গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাবার পর আর আর কিছু মনে ছিল না।

যুদ্ধ শেষ হবার খবরে আশা জেগেছিল ড্রুগ্যার আবার ফিরে যাবে জার্মানীতে। ফিরে পাবে স্ত্রীকে আর ছেলেকে।

ক্রাচে ভরদিয়ে ড্রুগ্যার এসে নেবেছিল হ্যামবুর্গে। ড্রুগ্যারকে নিতে কেউ আসেনি সেদিন। যারা এসেছিল তারা নিতান্তই সরকারী কাজের খাতিরে আর সেবা প্রতিষ্ঠানের লোক।

ওদের পুরোনো বাড়ীটা ভেঙ্গে গেছে। নতুন করে মস্ত বাড়ী তোলার তোড়জোড় চলছে সেখানে। বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করে ঠিকানা পেলো। খুঁজে পেলো স্ত্রী আর ছেলেকে।

সরকার থেকে নতুন বাড়ী দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে আটটা বছর হাওয়ার গতিতে কেটে গেল। সব ফিরে পেয়েছিল

ড্রুগ্যার। যুদ্ধে খোয়া যাওয়া ওর বাঁ পায়ের দুঃখটা বোধকরি সে মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল ড্রুগ্যার।

বলতে বলতে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো ড্রুগ্যারের। 'তার পরের ইতিহাস আর নাই বা শুনলে'। ড্রুগ্যারের গলায় কেমন যেন মিনতির স্থর বেরিয়ে আসছে।

ঠিক যোগাযোগ করতে পারছিলাম না কি করে এলো এই 'ওল্ড পিপলস হোমে।' জিজ্ঞাসা করলাম 'তারপর এই হোমের জীবন আপনি কি নিজেই বেছে নিলেন ?'

'দুঃখ সেখানেই।' ড্রুগ্যার এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

'জানো এর পর জীবনের ঘটনা এত তাড়াতাড়ি বদলে গেলো আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।'

কথা বলতে গিয়ে ড্রুগ্যারের গলা বার বার বন্ধ হয়ে আসছিল।

'ছেলে তখন বড় হয়েছে। কাজ করতে চলে গেল কিল শহরে। বিরাট কারখানা। ছেলে সেখানে শিষ্ট ইনচার্জ হয়ে গেল। পড়ে রইলাম আমি আর আমার স্ত্রী।

খারাপ কাটছিল না আমাদের। কিন্তু তার মাস সাতেকের মধ্যে ধরা পড়ল ফ্রাউ ড্রুগ্যারের ক্যান্সার হয়েছে।

খাওয়ার পর হজম হোত না। হাঁসপাতালে দেখাবার পর ওরা পরীক্ষা করে বললো অপারেশন করতে হবে।

অপারেশন করার প্রথম মিনিটেই ডাক্তাররা বুঝতে পারলো পেটে ক্যান্সার হয়েছে। ওরা আর কাটাছেড়া করেনি।

ফ্রাউ ড্রুগ্যারের পেটের ঘা তখনো শুকোয়নি। ডাক্তারের কাছ থেকে লোক এলো আমাদের বাড়ীতে। ওদেরই কাছ থেকে জানতে পারলাম ক্যান্সারের কথা।

ছেলেকে ডেকে পাঠালাম। তার হ্যামবুর্গে যাবার স্থবিধে হবেনা বলে ছেলে এলো না।

ফ্রাউ ড্রুগ্যার মারা গেলো তার তিন সপ্তাহের মধ্যে।

ছেলে আসেনি মাকে দেখতে। শুধু মাকে কেন তারপর থেকে আমারও আর খোঁজ নেয় নি।

কোথাও আর যাবার জায়গা রইল না। সরকার থেকে আমায় পাঠিয়ে দিল এখানে।

চোখ দুটো রুমালে মুছে ড্রুগ্যার বলছিল 'বড়ো একা লাগে এখানে। রোজ সকালে বাইরের বারান্দায় বসে থাকি আর লোকজন দেখি। এখানকার কারু সঙ্গে কথা বললে সেই এক কথা। সব্বাইর সেই এক দুঃখ।'

'আমায় ছেলে তাড়িয়েছে আর ঐ যে দেখছো নিকি বুড়ো ওর বউ ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'নিকিও আমার মতো যুদ্ধে গিয়েছিলো তারপর ধরা পড়লো। কিন্তু দেশে ফিরে এসেছিল পাগল হয়ে। এমনিতে ভালো চুপ চাপ থাকে। হঠাৎ কেউ ঝগড়া করছে চেঁচাচ্ছে এ দেখলেই ও ক্ষেপে যায়।'

ড্রুগ্যার বলছিল 'তবে সব মিলিয়ে এ জায়গাটা খারাপ নয়। হাসপাতাল রয়েছে এর সঙ্গে। খাবার দাবার ভালো। ওই বড় রসুইখানা থেকে রোজ ট্রলিতে করে খাবার আসে আর এখানে সবাইকে খাবার বেড়ে দেওয়া হয়। কেউ বা আবার নিজে খেতে পারেনা সামনে মুখ দিয়ে লালা বেরোচ্ছে।'

'দেখেনি ঐ ঘরের এণ্ডুকে?' শুনছিলাম মন দিয়ে, তৈরী ছিলাম না প্রশ্নের জন্য।

বললাম 'জানোতো মাত্র দিন দুয়েক হলো এসেছি তাই সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওঠেনি।'

এণ্ড্রুকে রোজ খাইয়ে দেয় সিষ্টার এসে।

মাঝে মাঝে ওপাশের মেয়েদের হোম থেকে মহিলারা কেউ কেউ বেড়াতে আসে। সে সব বিকেলগুলোতে বেশ একটা উৎসাহ দেখা যায়। চেনাশুনো আলাপ পরিচয় অনেকের সঙ্গেই থাকে না। তবু আশি বছরের ভদ্রলোক অষ্টআশি বছরের ভদ্রমহিলার হাত ধরে পড়ন্ত রোদে একটু বেড়িয়ে এলেন।

মেয়েরাও কেউ বা স্বামী পরিত্যক্তা। কারু আবার আত্মীয় স্বজন বলতে তিন কূলে কেউ নেই।

অনেকের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব আছেন কিন্তু মনের ক্ষোভে আর দুঃখে চলে এসেছেন হোমে। মাঝে সাজে বন্ধু বান্ধব কিম্বা নাতি নাতনিরা খোঁজ খবর নিতে আসে।

যাদের সরকারী পেনশন আছে তারা নিজের টাকা দিয়ে থাকেন। আর যারা একেবারে নিঃস্ব তাদের খরচ দেয় হ্যামবুর্গের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

দুচার জন যাদের ছেলে মেয়ে রয়েছে তারা এসে মাসের প্রথম দিকে বাবা মাকে দিয়ে যায় দশ বিশ মার্ক।

মার্কগুলো হাতে পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় কান্টিনে।

কফির অর্ডারে ধুম লাগে। আবার কারো বা অর্ডার হয় কোনিয়াকের। ভদ্রতাও করতে হয়। দু'এক জনকে সঙ্গে ডেকে নেয়।

ক্যান্টিনে বসে কোনিয়াক খাচ্ছিল উইলিয়াম আর এরিক। মনে হোলো অনেকদিন পরে কোনিয়াক পেটে পরতে মনটা চাঙ্গা হয়ে এসেছে।

'বুড়ো হলেও তোমার ভাবনা কি বলো?' উইলিয়াম বলছিলো এরিককে।

'অথর্ব হও আর পঙ্গুই হও কোন ভাবনা নেই। সবাই ভুলে যাক তোমাকে। আর দেশ তো তোমায় ভুলছে না! যা মন চায় তাই করে যাও।'

এরিক জানেনা কি জবাব দেবে। ও দু চোখেই কম দেখে। তাতে আবার হাত নেই। যে ডাকে তার কাছে যায়। লোকে বক বক করে ও শোনে।

চেষ্টা করে সমব্যথি হতে। কোথা থেকে নিজের দুঃখ এসে ঢেকে ফেলে নিজের সব সত্ত্বাকে। কাঁদতে চায়। চোখ দিয়ে জল বেরবার উপক্রম হয়। কিন্তু বেরোয় না।

চাপা গোঙানির মতো শব্দ করে উঠে আরেক জায়গায় গিয়ে বসে।

হয়তো খুঁজেছে একটু শান্তি। কারো কাছে চাইছে নিজের জন্য সহানুভূতির তুটো কথা। ও সবাইর কথা শুনছে! ওর কথা কে শুনবে? পাগল হতে যেটুকু বাকী আছে সেটুকু ও হয়ে যাবে শুধু অন্যের বিষাদ আর ব্যর্থতার কাহিনী শুনতে শুনতে।

এরিক চলে গেল বারান্দার বাইরে।

বিকালবেলাটার বেশ ধূমধাম পড়ে যায়. যাদের যাদের সাধ আহ্লাদ আছে তারা পুরোনো সামরিক পোষাক পরে গর্ব্ব ভরে সামনের, লনে বেড়াতে যায়। কেউবা ক্রাচে ভর দিয়া আবার কেউ বা অন্যের হাত ধরে।

যারা কারো সাহায্য নেয় না তারা নিজেদের অন্য শ্রেণীর বলে গন্য করে। অন্ধ আর পঙ্গুদের সাহয্যের জন্য এগিয়ে যায় অনেক। এরা যে আত্মনির্ভরশীল সে ভাবখানা বজায় রাখতে চায়।

কেউ আবার পেনসনের পয়সা বাঁচিয়ে সন্ধ্যে বেলা জিউক বক্সে পয়সা ফেলে চড়া সুরের আধুনিক গান শোনে।

পেনসনওয়ালারা একটু সামলে থাকে। যে সপ্তাহে পেনসন আসে সে সপ্তাহেই ছেলে বৌ আর নাতি নাতনির আনা গোনা বেড়ে যায়।

স্নেহ কাতর দাতু কিম্বা ঠাকুমা নাতির হাত থেকে একটা সুন্দর ফুল আর এক বাক্স চকোলেট পেয়ে মহাখুশি।

ভুলে যায় ছেলে মেয়েদের অত্যাচারের কথা সব কিছু ভুলে গিয়ে একটা দশ মার্ক হয়তো গুজে দেয় নাতি নাতনির হাতে।

হাড় কাঁপান ঠাণ্ডায় সকাল পাঁচটায় উঠতে সত্যি কষ্ট হয়। উপায় নেই। সবাই করছে আমি কোথাকার কে!

সকাল সাতটায় হোমে হাজির হতে হবে। সেচ্ছাসেবী বলে রুটিন তো আর বদলাবে না। আমরা আছি দিন কয়েকের জন্য।

তাতে ওল্ড পিপলস হোমের সাহায্য হচ্ছে, কিন্তু সারাটা বছরের কথাও তো ভাবতে হবে।

কথাগুলো নিজের মনে মনে বলে চট করে উঠে পড়তাম সকালে।

একবার পৌছে গেলে দিনটা কেটে যেতো। শিবিরে ফিরতে ফিরতে সেই পাঁচটা। পুরোনো ক্যাসেলে ফিরে এলে ক্লান্তি আর অবসাদে একসঙ্গে চেপে ধরতো শরীরটাকে।

হোম থেকে ফিরলেই লাউঞ্জে দেখা হতো ওসালোর সঙ্গে। নরওয়ে থেকে এসেছে ওসালো। লিটারেচারেচারের ছাত্রী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বলে। আরো দশ জনের চেয়ে বেশ ভালোই বলতে হবে। অন্ততঃ চেষ্টা করে।

সেই একই প্রশ্ন 'হ্যালো হোয়াই ইউ হ্যাড ডান টুডে' প্রতিদিনই ওকে প্রথমে ফিরিস্তি দিতে হবে আজ কি করেছি।

বিরক্ত হতাম না। অন্তত সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফেরার সময় কেউ খোঁজ করছে! সম্ভবতঃ তাই বলেই বিরক্তি দেখাই নি। দিনের কাজের কিছুটা ওসালোকে বলে তার পর হাত পা ধোয়া আর অন্য কিছু।

আমি নিচে নাবার আগে ততক্ষণে সাপারে বসে গেছে ডেনিস, ইঙ্গে পিটার ভালট্রাউট জেমস আর মণিকা।

সাপার শেষ হলেই জমে উঠতে গান, তামাশা আর যার যার নিজের দেশের গল্পো।

কথা বলতাম গল্পো করতাম কিন্তু চোখ দুটো থাকতো দরজার দিকে।

ব্রিগিটা আসতো অনেক দেরী করে।

আবার কোনদিন হয়তো আসতো না। সেদিন দুঃখের চেয়ে রাগ হতো বেশী। বাধা ধরা কিছু ছিলো না। অধিকার খাটাবার

মতো দাবীও নেই। তবে ব্রিগিটা এলে ভলো লাগতো। না এলে জিজ্ঞাসা করতাম 'কাল এলে না কেনো?'

ব্রিগিটা হেসে জবাব দিতো 'কই আসবার জন্য তো বলো নি।'

'জানি প্রত্যেক সন্ধ্যেয় তুমি আসো তাই আর বলিনি।' খুশী হতো কিনা জানিনা তবে তারপর থেকে আটটা না বাজতেই এসে হাজির হতো ব্রিগিটা।

একই বাড়ীতে এতো লোক আছি তাই বিশেষ করে পরিচয় করার সুযোগ হয়নি কারো সঙ্গে।

'পোলিশ আর পূর্ব্ব জার্মান বাস্তুত্যাগীদের বাড়ীটাতে হঠাৎ নতুন কারা এলো!' খোঁজ করতে এসেছিলো ব্রিগিটা।

বাদামী চুল। কালো চোখ আর সব কিছু মিলিয়ে অদ্ভুত সুন্দর দেখাতো ব্রিগিটাকে।

শিবিরের ছেলেদের নিজেদের মধ্যে কথা হলে সবাই একবাক্যে বলতো ব্রিগিটাই হলো মিস বারসাবুইর্টেল।

পিটার বলেছিলো ব্রিগিটাকে 'তোমার মতো সুন্দর মেয়ে জার্মানীতে কোথাও নেই।'

ব্রিগিটা জার্মান আর পোলিশ ছাড়া কিছু বোঝে না।

পিটারের কথায় জার্মান তর্জমা করে দিয়ে ছিলাম আমি।

ব্রিগিটা হেসে বললো ওকে বলে দাও 'আমি জার্মান নই।'

আমার মধ্যস্থতায় ব্রিগিটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা পিটারের ভালো লাগেনি। খানিক বাদে উঠে গিয়েছিলো।

হাসলে আরো ভালো লাগে ব্রিগিটাকে।

প্রথম দিনটায় ও নিজে এসেছিলো আলাপ জমাতে।

টেবিলে বসে চিঠি লেখার চেষ্টা করছিলাম। শুনতে পেলাম পেছন থেকে কে বলছে 'এতো মনোযোগ দিয়ে কাকে লিখছো!'

পেছন ফিরে দেখি ব্রিগিটা। নাম ধরে পরিচয় করবার দরকার হয়নি। ওর নাম ব্রিগিটা এটা শিবিরের সবার কাছেই জানাছিলো।

সত্যি কথাটা বলে দিলাম 'এ বাড়ীতে তোমায় বহুবার দেখেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ঠিক আলাপ হয়নি এর আগে।'

ঠিক আলাপ হয়নি একথা বলবো না। ব্রিগিটা এসেছিলো আরেক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। দেখতে এসেছিলো। এরা কারা এলো নতুনকরে এ বাড়ীটাতে ?

কথাটা আমি একটু ঘুরিয়ে বললেও ব্রিগিটা আরো সোজা করে বললো 'আমি দেখেছি তোমাকে। যখনই যাওয়া আসা করি আমার দিকে তাকিয়ে থাকো।'

এতো খোলাখুলি কথাটা বলবে ভাবতে পারিনি। লজ্জা ঢাকতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। হার মানার চেষ্টা না করে বললাম 'তুমি দেখতে সুন্দর। তাইতো তোমায় দেখি!'

'তবে এগিয়ে এসে আলাপ করোনি কেন?' ব্রিগিটা হার মানবার মেয়ে নয়।

কি জবাব দেব ভাবছিলাম। ব্রিগিটাই সমাধান দিয়ে দিলো 'ঠিক আছে এখন থেকে তোমার আমার আলাপ হয়ে গেলো। আর তোমার তাকিয়ে থাকতে হবে না।'

ব্রিগিটা পোলিশ রেফিউজি। মা বাবা নেই। ও আর ওর বড় বোন দুজনে মিলে আছে 'ক্যাসলের' একটা ঘরে। পোল্যাণ্ডের কথা বড় একটা মনে করে না। বলে 'মনে করে' কি হবে বলো। মিছি মিছি দুঃখ পাওয়া।

রেডিও তৈরীর কারখানায় কাজ শিখেছে।

কোন জড়তা নেই। যা পাচ্ছে তাতেই খুশী।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা বায়না ধরলো বাংলায় ওর নাম লিখে দিতে হবে।

রাইটিং প্যাডের কাগজে ওর নামের পোলিশ বানান লিখে দিলো। নাম লেখাতে খুশি হলো তবে তাতেই হবে না ওকে বাংলা গান শোনাতে হবে।

কথায় কথায় ব্রিগিটা বলতো 'দেখো খুব বেশী বড় বড় কথা রাজনীতি আর ভারী মুখকরে বসে থাকা আমার ভালো লাগে না।'

সিগারেট দিলো। সিগারেট খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করছিলাম এই ক্যাম্পের জীবনের কথা।

'ওতে কিছু আসে যায় না। কোথায় থাকলে আর কি ভাবে থাকলে কি হবে সে সব নিয়ে চিন্তা করে। কাজ করছি মজা করছি আবার কি ? আমার গান ভালো লাগে। নাচতে ভালো লাগে'।

সন্ধ্যের পর ব্রিগিটা না আসা অব্দি মনটা যেনো কেমন মিইয়ে থাকতো। ব্রিগিটা বুঝতো সেটা। প্রতি সন্ধ্যেয় ব্রিগিটা আসতো।

মাঝে মাঝে ও এসে বিরক্ত হয়ে চলে যেতো।

স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে কাজকর্মের আলোচনা। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। দৈনন্দিন সমস্যা। এ সব নিয়ে যখন কথাবার্তা হোত বুঝতে পারতাম ব্রিগিটার ভালো লাগছে না।

ইংরেজী না বোঝার দরুন মুস্কিল হতো আরো বেশী। খানিক-ক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শোনার ভান করতো। তারপর উঠে চলে যেতো অন্য কোথাও।

ব্রিগিটা চলে গেলে আমিও মন দিতে পারতাম না কথাবার্তায়।

সেদিন ব্রিগিটাকে চলে যেতে দেখে ইশারায় বললাম 'বাইরে অপেক্ষা করো আমি আসছি।'

রোজবিতা অসন্তুষ্ট হবে আমি হঠাৎ মিটিং ছেড়ে চলে গেলে। কথাটা একবার ভাবলাম। কিন্তু ব্রিগিটার জন্য আকর্ষণ অনুভব করছিলাম তার চেয়ে বেশী।

খানিকবাদে চলে এলাম বারান্দায়। 'তোমাদের এই মিটিং করে কি হয় বলোতো ? সারাদিন কাজ করো আবার এতো কথা কিসের ?'

যুক্তি তর্ক করার চেষ্টা না করে বললাম। 'তাই তো তোমার সঙ্গে গল্প করতে চলে এলাম সব কিছু ফেলে।'

ব্রিগিটাও ভাবতে পারে নি সত্যি চলে আসবো মিটিং ছেড়ে।

একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছে ব্রিগিটা আর বলে চলেছে ওর ছোট বেলার কাহীনি।

খুব ছোটবেলায় এখানে এসেছি।' বাবাকে মনে নেই।' আসার চার মাস পরে বাবা মারা গেলে এসব শুনেছি আমার বোনের কাছে। মাও এসেছিল এখানে, দু বছর আগে মারা গেছে।'

ব্রিগিটা কথা বলছিল আপন বৈশিষ্টে। আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু আর বিয়োগ ব্যথায় ওর জীবনকে বিষাদগ্রস্ত করে নি।

আমার কথা তো অনেক শুনলে তোমার কথা কিছু বলো এবার। অনুযোগ প্রকাশ পেলো ব্রিগিটার কথায়।

জানতে চাইলো' এবারে কোথায় যাবো। শীতের শেষে সব শিবির শেষ করে লণ্ডনে যাবার কথা শুনে ব্রিগিটা জিজ্ঞেস করলো 'কেনো জার্মানী তোমার ভালো লাগে না? কি রকম মন খোলা সব লোক। কতো কাজ রয়েছে এ দেশে। থেকে যাওনা এখানে?'

প্রশ্ন করে ব্রিগিটা তাকালো আমার মুখের দিকে।

'কেনো, তুমি চাও আমি জার্মানীতে থেকে যাই?'

'সেটা আমি তোমার জোড় করতে পারি না। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগে। তাই চাই তুমি থাকো।'

'শুধু ভালো লাগে! আর কিছুনা?'

কথাটা হয়তো ভেবে বলিনি তাই নিজেও চমকে গেলাম।

ব্রিগিটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেলো ব্রিগিটার ঠোটে।

মাত্র ক'টা দিন হলো এখানে এসেছি। ব্রিগ্রিটার সঙ্গে আলাপ তার চেয়ে ও কম। তবু মনে হলো ব্রিগ্রিটার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। অন্তরঙ্গ বোধ আপনা থেকেই মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে।

কথাটা চাপা দেবার জন্য ব্রিগ্রিটা আর আমি দুজনেই জোরে হেসে উঠলাম।

কথার মোড় ঘোড়াতে বিগ্রিটা বললো 'চলো খানিকটা বেড়িয়ে আসি।'

হাঁটছিলাম দুজনে সরু রাস্তাটা ধরে। আমি খানিকটা আনমনা হয়ে ছিলাম।

ব্রিগ্রিটার কথায় চমক ভাঙ্গলো 'তুমি এতো রোগা কেনো বলতো।'

'এটা কি একটা প্রশ্ন হলো' কথাটা ওকেই ফিরিয়ে দিলাম।

হাটছি আমি আর ব্রিগ্রিটা। রাত বেশ গভীর হয়ে এসেছে। রাস্তার আলোর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ব্রিগ্রিটার চুলের বাদামি রঙ। রাত্রি আর কুয়াশা মিলে ছড়িয়ে দিচ্ছে একটা আস্তরণ। তার মধ্যে ঢাকা পড়ছি আমি আর ব্রিগিটা। ওকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলে সে মুহূর্ত্তে।

ব্রিগিটার উপস্থিতি আমি অনুভব করছিলাম। মাঝে মাঝে ও তাকাচ্ছে আমার দিকে আর ঠোঁটের নিচে চাপা হাসি। হয়তো সাহস হারিয়ে গেছে কথা বলতে।

আমি বলতাম 'এবার ফেরা যাক। অনেক রাত হয়েছে। কাল সকালে আবার সেই কাজ।'

মুখ নিচু করে ব্রিগিটা বললো 'তাতে কি হয়েছে! শনিবারে বেশী করে ঘুমুলেই চলবে।'

বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমিও মন্ত্র মুগ্ধের মতো ওর সঙ্গে পায় পায় এগিয়ে চলেছি।

ব্রিগিটা একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে গুজে দিলো নীরবতার সঙ্গে। খেই ধরবার জন্য একটা কিছু অবলম্বন পেলাম।

দু-চার বার সিগারেটে টান দিচ্ছি আর পথ চলছি।

কোন কথা বলার চেয়ে সে মুহূর্ত্তটাকে উপভোগ করতে চাইছিলাম।

ব্রিগিটা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো পথ রোধ করে।

'কি একাই সিগারেট খাবে।' আমার ঠোঁট থেকে সিগারেট নিয়ে ও নিজে খেতে সুরু করলো।

সিগারেটের ধোয়া গুলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার মুখে।

বললাম 'তুমি বড্ডো দুষ্টু।'

কথা বলার সুযোগ পেয়ে ব্রিগিটা তৎপর হয়ে বললো 'কেন তুমি দুষ্টুমি ভালোবাসো না?'

বললাম আরো কাছে এসো ব্রিগিটা। আমি তোমাকে আরো কাছে থেকে দেখতে চাই। দেখতে চাই তোমার কালো চোখ দুটোকে। তোমার বাদামি চুলে বুলোতে চাই আমার হাত।

ব্রিগিটার মুখে কোন কথা নেই। কোন জবাব দিলোনা আমার কথার।

অনুভব করলাম ও এগিয়ে এলো আমার আরো কাছে। এতো কাছে যে ইচ্ছে করলে আমার ঠোঁট দুটো ছুঁতে পারে ওর ঠোঁটকে।

স্পর্শ করতে পারছি ওকে। ব্রিগিটার চোখ দুটো বুজে এলো। অব্যক্ত ঠোঁটের স্পর্শে ভালোবাসা খুঁজে পেলো তার ঠাই।

কথায় বলতে অনেক সময় হয়তো লাগতো। একটি স্পর্শে হাজারো কথাকে পেছনে ফেলে অনুভূতি নিল রূপ।

ব্রিগিটা মাথা তুলে বললে 'কি ঘুম পাচ্ছেনা? কাল কাজে যাবেনা?

কথা বলেই ওর সেই হাসি। বললাম' সত্যি অনেক রাত হয়েছে। চলো এবারে যাওয়া যাক।'

ফিরছিলাম ব্রিগিটাকে পাশে জড়িয়ে। জড়তা অনেক কেটে গেছে।

খানিকটা বাদে ব্রিগিটা যেনো চঞ্চল হয়ে উঠলো।

'এই মুহূর্তে আমাকে তোমার খুব ভালো লাগছে তাইনা?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

জানো সবাই আমাকে বলে সুন্দর। আমার সঙ্গে ভাব করতে আসে। কিন্তু সত্যিকারে আমাকে কে চায় তা বুঝতে পারি না।'

ব্রিগিটাকে সিরিয়াস হতে দেখে আমারও ভালো লাগছিলো না।

ব্রিগিটা আবার বললো 'প্রেম, ভালোবাসা এর মানে বুঝিনা আর বোঝবার চেষ্টাও করিনা। তু'একবার চিন্তা করবার চেষ্টা করেছি, ভালো লাগেনা চিন্তা করতে। কেনো জানিনা একটা ভয় আর শংকা জাগে মনে। পারিনা কাউকে বিশ্বাস করতে।

কেউ যখন বলে আমায় ভালোবাসে, আমার মনে হয় সেটা শুধু বলার জন্যই বলা।

আমি বললাম 'ব্রিগিটা এটা তোমার অত্যধিক আত্মসচেতনতার কুফল। নিজেকে স্বাভাবিক করলেই বুঝতে পারবে অন্যকে।'

'স্কুলে যাইনি, লেখাপড়া সামান্যই শিখেছি। দেখো অতো কথা বুঝিনি।' অনুযোগ করে বললো। 'আর তোমার কাছে যে কিছু জেনে নেবো তারও বা সুযোগ কোথায়। কদিন পরেই তো চলে যাচ্ছো এখান থেকে।'

প্রবোধ দেবার সুরে বললাম 'এখানে থেকে যাবো বলে তো আগে ঠিক করিনি।'

'ব্রিগিটা মানুষের কল্পনার ভালোবাসা আর বাস্তবের ভালোবাসা দুটো আলাদা।'

তুমি কল্পনার ভলোবাসার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখো না। আমি তোমার মধ্যে সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যতাকেই ভালোবাসি। তুমি সুন্দর তাই তোমাকে ভালো লাগে।

সোজা সত্যি কথা ব্রিগিটার মনকে স্পর্শ করলো। ওর সেই গর্বকে আঘাত করলো না।

'এ সত্যি কথাটাই শুনতে চাই।' স্বাভাবিক হয়ে এলো ব্রিগিটা।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ঠাণ্ডায় ওর ঠোঁট আরো রঙীন হয়ে আছে। ওর গালগুলো হয়েছে বাদামি।

ক্যাসেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা দুজনে। প্রশ্ন করলাম 'কাল কখন আসছো ?'

'তুমি বলো কখন আসবো ?' অন্ততঃ যে কটা দিন আছো তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই সে সন্ধ্যেগুলো।' ব্রিগিটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। জগতটাকে সোজা করে বোঝবার চেষ্টা করে।

শুধিয়ে ছিলাম 'আমি বলে গেলে ভুল বুঝবে না তো আমাকে ?'

'ভুল বোঝার তো কিছু নেই। আমার ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। তোমার ভালো লাগে আমায় দেখে। এর চেয়ে পরিষ্কার আর কি হতে পারে বলো ?' এবার বিদার নেবার পালা 'গুড নাইট ব্রিগিটা।'

শুভ রাত্রি জানিয়ে ব্রিগিটা আলতো করে আমার গালে চুমু খেয়ে ভেতরে চলে গেলো।

পরের দিন ব্রিগিটা এসেছিলো দেরী করে। ততক্ষণে আমি আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

হামবুর্গ থেকে ইয়ুথ গ্রুপ এসেছে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। জানালার ধারে চেয়ারে বসেছিলাম আমি। পুরোদমে ডিসকাশান চলছে তখন।

টুক করে মাথার পেছন দিক থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট এলো। ভাবলাম কেউ সিগারেট অফার করছে।

খুলে দেখলাম ছোট একটা কাগজে লেখা রয়েছে 'বাইরে এসো।'

বাইরে তাকিয়ে দেখি ব্রিগিটা হাসছে।

অল্পক্ষণের বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম। বললাম কি বলবে বলো ?

'কেনো, কিছু না বললে বাইরে আসা যায় না ?'

আমি বললাম 'যাবে না কেন ? তবে বাইরের লোক এসেছে আমার সঙ্গে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে। এক্ষুণি আমি কি করে চলে আসি বলো ? আমাকে থাকতে হবে আলোচনায়।

ছোট প্রশ্ন করলো ব্রিগিটা 'সব আলোচনা কি ইংরেজিতে হচ্ছে ?'

বললাম 'সবটা না, রোজবিতা মাঝে মাঝে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছে।'

'তবে চলো'

খুশী হলাম ও আলোচনায় বসে থাকবে।

পশ্চিমী আলোচনা হচ্ছিল সেচ্ছাসেবীর সঙ্গে। যুবক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক।

কথায় কথায় আমায় বলতে হলো। আমাদের দেশের যুবকরা হয়তো পশ্চিমী যুবকদের মতো নিয়ম মাফিক অরগেনাইজড্ হয়ে হয়ে সমাজ সেবা করে না। তবে থিয়েটার পূজো সিনেমা শোর ব্যবস্থা যে হামেশা যুবকরাই করে থাকে। তা ছাড়া রয়েছে রাত বিরাতে মড়া পোড়ানো। কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার আওতায় ওগুলোর সুবিধে বড়ো বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। সে সব কাজে। যুবকদেরই এগিয়ে যেতে হয়।

আলোচনার বেশীর ভাগটাই হচ্ছিল ইংরেজিতে।

খানিকটা কথাবার্ত্তা শুনে ব্রিগিটা উঠে চলে গিয়েছিলো।

হাব ভাব দেখে মনে হোল এসব আলোচনা খুব একটা ভালো লাগছে না ওর।

বৈঠক ভেঙ্গে যাবার পর অনেক রাত বসেছিলাম লাউঞ্জে।

ব্রিগিটা এলো না। অন্য আর কোন সন্ধ্যায় ব্রিগিটাকে দেখিনি।

বারসবুইটেলের দিন গুলো কেটে গেলো। সন্ধ্যে হলে একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। বার বার তাকাতাম রাস্তার দিকে।

অন্ধকারে পায়ের শব্দ শুনে সজাগ হয়ে থাকতাম। পরিচিত অপরিচিত কোন শব্দের মধ্যে খুজে পেতাম না ব্রিগিটাকে।

ব্রিগিটা আর কোন সন্ধ্যায় ভারতীয় বন্ধুর খোঁজ নিতে ফিরে আসেনি।

পরের দিন কাজ থেকে ফিরে আসার পর ইঙ্গে আমায় জানালো রোববারে বার্লিন থেকে ঘুরে আসবার জন্য একটা দল গড়া হচ্ছে।

বার্লিন বেড়ানোর সখ চেপে রাখতে পারলাম না। ইঙ্গেকে বললাম 'আমার টাকা পয়সা বিশেষ কিছু নেই। যদি কনসেশান করো তবে যেতে পারি।'

ব্যবস্থা হয়ে গেলো বার্লিনে যাবার।

হ্যামবুর্গ থেকে বার্লিন দুশো কিলো মিটারের মতো পথ। অটোভানে একবার গাড়ী উঠলে হাওয়ার গতিতে চলতে থাকে।

বার্লিন। নামটার মধ্যেই রয়েছে একটা গুরু গম্ভীর ভাব। কতো কালের কতো ইতিহাস ওই নামটার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

কাইজারের রাজত্ব থেকে হিটলারের উত্থান হিটলারের পতন। সব কিছুর স্মৃতির টুকরো অংশ এখনো খুজলে পাওয়া যায় বার্লিনের মধ্যে।

আর অল্পদিন আগে মাত্র ছিলো বার্লিনকে ঘিরে কতো রেষারেষি কতো কারচুপি। একদিকে আমেরিকা ও পশ্চিমী গোষ্ঠী অন্য দিকে রাশিয়া।

পূর্ব বার্লিনের বাস্তুত্যাগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।

খবরের কাগজের একটা ছবির কথা মনে পড়ে গেলো। একজন মাঝ বয়েসি লোক বার্লিনের দেয়াল টপকে আসছিল পশ্চিম ধারে। হঠাৎ কোত্থেকে পাহাড়ওয়ালা এসে পা টেনে ধরলো। ততক্ষনে বেচারার দুটো হাত আর বুক অব্দি চলে গেছে দেশের অন্য সীমান্তে।

নাছোড়বান্দা সীমান্ত রক্ষী। তেমনি নাছোড়বান্দা ভদ্রলোক। টানা হেঁচড়া চললো। সীমান্ত রক্ষী পা ছেড়ে দিয়ে পাৎলুন টেনে

ধরলো। বেশ খানিক্ষণ টাগ অফ ওয়ার চলার পর ভদ্রলোক পাৎলুনটি পূর্ব বার্লিনে রেখে দেয়ালের উপরে উঠে লাফিয়ে পড়লেন পশ্চিম বার্লিনে।

দেশ ভাগ মানুষকে করেছে নিঃসম্বল। দুঃখ দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনাকে মানুষ বরণ করে নিয়েছে হাসিমুখে। কিসের আশায়? স্বাধীনতা? নিরুপদ্রপ জীবন? সমান অধিকার? জীবিকার নিশ্চয়তা? দুশ্চিন্তা কিম্বা ভয় থেকে মুক্তি!

রাজনীতবিদরা আর নেতারা যখন আলাদা আলাদা ভেবে কোন কিছুর সমাধান দিতে পারেন না তখন সবাই মিলে বৈঠক করে ঠিক করেন দেশ ভাগ করার।

যখন একা বা একক গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না তখন সবাই মিলে এক সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক যে কিছুই করতে পারা গেলো না। ব্যস তারপর ফরমুলায় ফেলে ভাগ করে দাও দেশকে।

সমস্যার সমাধান তাতে হয়েছে কি?

বাংলা পাঞ্জাব আর বার্লিনের কথা যদি বাদই দি তবে আজ উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে এতো অসন্তোষ কেন? কেন তবে অসন্তোষ ভিয়েৎনাম কম্বোদিয়াকে ঘিরে? কি অপরাধে আজ বিক্ষুব্ধ মধ্যপ্রাচ্য সেই দেশ ভাগের আরেক বলি।

এর জবাব আজ কে দেবে? ঐতিহাসিক লিখে যাবে রাজনৈতিক ঘটনা চক্রে যুদ্ধ বিগ্রহ আর তার ওপর আলোচনা আর মীমাংসার প্রলেপ বুলিয়ে শান্তির কথা।

তারা কি কোনদিন লিখবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের জীবন ইতিহাস? হাজারো সর্ব্বহারার ব্যর্থ হাহাকারের ক্রন্দনের দিন পঞ্জী? যতো নিপীড়িত মানুষ বলি হলো দেশ ভাগের কে রেখেছে তার হিসেব?

বার্লিনের দেয়াল দেখছিলাম আর ভাবছিলাম এই ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাসের কথা। চমক ভাঙ্গল ইঙ্গের ডাকে।

ইঙ্গে আমায় জিজ্ঞাসা করলে 'বিসডু মুইডে ?'

জবাব দিলাম 'কই না তো !'

ইঙ্গে জানতে চাইলো 'বাংলায় এর মানে করলে কি দাঁড়ায় ?'

বললাম 'বিসডু মুইডে মানে হোল তুমি কি ক্লান্ত ?'

ইঙ্গে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলো 'তুমি গি গ্লাণ্ড !'

বললাম 'ঠিক হয়েছে। এর চেয়ে ভালো বাংলা উচ্চারণ তোমার ঐ ডেনিশ জিহ্বায় একবারে করা সহজ নয়।'

ইঙ্গে, পিটার, জেমস, ভালট্রাউট আমরা সবাই ফিরে এলাম আমাদের গাড়ীটার কাছে। এবারে ফিরতে হবে হ্যামবুর্গে!

গাড়ীতে বসে আছি অনেকক্ষণ কারো সাড়াশব্দ নেই।

ইঙ্গে কথা বললো প্রথমে। 'ডি তুমি কখনো যুদ্ধ দেখেছ ?'

বললাম যুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিলাম তাই তুএকটা ছোট টুকরো ঘটনা ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

মনে পড়ে সাইরেণ বাজার শব্দ। সবাই বলতো জাপানিরা বোমা ফেলতে আসছে। শহরের ঘর বাড়ী বিক্রি করে অনেকে চলে আসতো পাড়াগাঁয়ে। আলাপ হোত নতুন নতুন বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের কাছে শুনতাম শহরের কতো সব অবাক কাহিনী।'

ইঙ্গের জন্ম যুদ্ধ যখন তুমুল উঠেছে সেই সময়ে চারদিকে ধ্বংস আর হাহাকার। 'তার মধ্যে জন্ম আমার। জানো ডি আমার মা বলেন মানুষ এতো তুঃখ তুর্দশা সহ্য করবার পর আবারো কি করে যুদ্ধের কথা চিন্তা বুঝতে পারেন না।'

বললাম 'সময়ে মানুষ সব ভুলে যায়।'

আমরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছি হ্যামবুর্গে।

মেলামেশা আর চেনাশুনো বেড়েছে। আর ঠিক সেই সময়টাতে শেষ হয়ে এলো 'বারসবুইটলের' কর্ম শিবিরের মেয়াদ। কোন গড়ার আগেই যেন ভাঙ্গার বন্দোবস্ত।

গতো কয়েকটা মাস শিবিরে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে এটাই

আমার জীবন। একটা শিবির ভেঙ্গে গেলে নিরাপত্তার অভাব বোধ করি।

ইওরোপে গ্রীষ্মের কর্ম শিবির প্রতি বছরে এমনই গড়ে ওঠে আবার এমনি করেই ভেঙ্গে যায়। পেছনে কি পরে থাকে কে তার হিসেব কষছে!

শেষ শনিবার ফেয়ারওয়েল পার্টি এলিজার বাড়ীতে।

এলিজা ইহুদি। ইসরায়েলে বাড়ী আছে। জার্মানীতে একটা ফ্ল্যাট রেখেছে। পড়াশুনোর সুবিধের জন্য। ওর বাবার ব্যবসা পত্তর কাজ কর্ম সব এখান থেকেই চলছে।

হাতে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে আলাপ করছিলাম এলিজার সঙ্গে।

সাত বছর হয়ে গেলো এখানে আছে। ওর বাবা গ্রীষ্মে আসে জার্মানীতে আবার শীতে চলে যায়।

নাৎসী আমলে ওর বাবা পালিয়ে গিয়েছিলো জার্মানী থেকে।

এলিজা আজকে আমাদের হোষ্ট। ওর আদুলে আদুলে শরীর নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছে।

বেশীক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়াবার সময় নেই এলিজার।

তিনটে ঘরের ফ্ল্যাট। বারান্দার দিকের ঘরটায় আমাদের পার্টি জমেছে।

প্রচুর ড্রিঙ্ক্‌স আর খাবার বন্দোবস্ত করেছে এলিজা। তবু মন দিতে পারছিলাম না পার্টিতে।

এলিজা অন্য কার সঙ্গে কথা বলতে চলে গেলো। চুপচাপ বসে ছিলাম ঘরের এক কোনে।

ইঙ্গে এসে দাঁড়ালো বারান্দার দিকটাতে। আমায় চুপ করে বসে থাকতে দেখে ইঙ্গে জানতে চাইলে 'চুপ চাপ বসে আছি কেনো?'

'ভালো লাগছে না তাই।' উল্টে ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম 'তুমি নাচছো না যে কি ব্যাপার?'

অনেক নেচেছি। আর ইচ্ছে করছে না, আর সত্যি কথা কি জানো আমার এ সব ভালো লাগে না।

অবাক হলাম ইঙ্গের কথায়। সেকি তোমার খারাপ লাগার কি কারণ ঘটলো?

ইঙ্গে যেনো কি রকম গম্ভীর হয়ে গেলো। গম্ভীর হতে দেখে ওকে বললাম 'কি ব্যপার পার্টনারের অভাব বোধ করছো নাকি?'

ইঙ্গে জানালো 'না ঠিক তা নয়। বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারিনা এই সব কারণে হৈ হুল্লোড়।' আমার বয়েসি সবাই যা করছে আমার ঠিক ভালো লাগেনা।'

খানিক্ষণ চুপ করে থেকে ইঙ্গে প্রশ্ন করলো—

'আচ্ছা 'ডি' এটা কি সত্যি যে ভারতে কোন স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার সঙ্গে মৃত্যু বরণ করতে হয়?'

হাসি পাচ্ছিল কিন্তু হাসি চেপে ইঙ্গেকে বললাম 'তুমি আজকাল বহু পুরোনো বই পত্তর পড়ছো বোধহয়! সহমরনে স্ত্রী সতী হোতো তবে সে বহু যুগ আগেকার কথা। বর্ত্তমানে এটা করা দণ্ডণীয় অপরাধ।

ইঙ্গের অদ্ভুত আগ্রহ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা আর গৃহস্থালী জীবন সম্পর্কে।

প্রশ্ন করলাম 'কি ব্যাপার ভারতীয় কাউকে বিয়ে করে ভারতবর্ষে যাচ্ছো নাকি?'

ইঙ্গে জবাব দিলো না। তবে আমার ছোট বেলাকার এক বন্ধু বিয়ে করে দিল্লির কাছে একটা জায়গায় গেছে। ও মাঝে মাঝে অনেক কথা লেখে তাই আমার ও দারুন কৌতূহল হয় জানবার।

'বন্ধুর স্বামী যখন ভারতে আছে তুমি দিন কয়েক ঘুরে এসো না ভারতে। আর বিশেষ করে তোমার যখন এতো আগ্রহ নিশ্চই তোমার ভালো লাগবে।'

যাবার তো ইচ্ছে আছে। সেচ্ছাসেবী হিসেবেই যেতে

চাই। টুরিষ্ট হিসাবে নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতে চাই। টুরিষ্ট হয়ে গিয়ে ওপর থেকে দেখে খুব বেশী কিছু বোঝা যায় না।

বললাম 'আমি যখন আসতে পেরেছি এতোদূরে তুমি ও ঠিক একদিন গিয়ে পৌছুবে ভারতে।'

ইঙ্গের সম্পর্কে কৌতূহল আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। বললাম 'বিশ্বের অতো উন্নত সব দেশ থাকতে ভারতে যাবার বাসনা হলো কেন তোমার?'

ও যেনো কেমন আনমনা হয়ে গেলো। স্বাভাবিক ভাবে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললো 'ভালো লাগে না এখানে।'

অবাক হলাম ইঙ্গের এই হতাশা দেখে।

ইঙ্গে নিজে থেকেই বললো 'জানো' এ দেশে জীবনের মূল্যবোধ ভীষণ কমে যাচ্ছে। মানুষ শুধু চিন্তা করছে আরো পাবার কথা। ব্যক্তিগতো সম্পর্কে প্রেম ভালোবাসার সত্যিকারে মূল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখতো পাচ্ছোনা আজকাল হাজার হাজার তরুণ তরুণী কেমন উদ্দেশ্য বিহীন ভবঘুরে হয়ে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই। অপরের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। প্রাণের ভেতর থেকে কি যেনো হারিয়ে গেছে।

তরুণ তরুণীরা নতুন একটা কিছুর আস্বাদের জন্য আজ সব কিছু দেখছো না এখন সবাই 'গুরুবাদের' প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

ইঙ্গের কথায় বাধা দিয়ে বললাম তাতে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক গুরু খোঁজে ড্রাগ্‌সের লোভে...।

ইঙ্গে কথায় বাধা দিয়ে বললো 'কথাটা পুরো সত্যি নয়। তবে আমি বলছিনা যে তা কখনও হয় না।'

ইঙ্গেকে জিজ্ঞাসা করলাম 'তাহলে তুমিই বলো সত্যিটা কি?'

আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি বছর দুয়েক আগে এমনি অসহায় হয়ে পারছিলাম যে নিজের প্রতি কোন বিশ্বাস ছিলো না

আমার।' সেসময়ে একজন গুরুজীর কাছে নিয়ে গেলো আমার এক বন্ধু।

তিনি আমার সব কথা শুনে বললে 'কখনো চিন্তা করে দেখেছো তুমি নিজেকে নিজে ভালেবাসো কিনা?' নিজেকে যদি নিজে ভালবাসতে পারো তবে ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারবে। পারবে সত্যিকারের ভালোবাসা আর প্রেমকে উপলব্ধি করতে।'

ইঙ্গের চোখ ছল ছল হয়ে আসছিলো। ও বললে। জানো 'ডি' এ কথা তো আমায় আগে কেউ বলে নি।'

খানিকটা থেমে ইঙ্গে বলে চলল। ইওরোপে আর আমেরিকায় আমাদের জীবন ধারণের গ্লানি আছে তবে অভাব বোধ নেই। রয়েছে প্রাচুর্য্য। কিন্তু মনটা হয়ে আসছে শূন্য নিঃসম্বল। কেউ যদি সত্যিকারে মনকে জাগানোর কথা বলে আমরা আমাদের সব কিছু তার পায় দিয়ে দিতে পারি।'

মানুষের সুক্ষ্ম অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেটিরিয়ে লিষ্টিক মানুষের বিষাক্ত নিশ্বাস হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষকে তার মনুষ্যত্বের জন্য দাম দেবার কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

আমরা দাম দিই, শ্রদ্ধাকরি কর্মক্ষম মানুষকে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের বিচার হয় যে মানুষটা কতোটা কলের মতো পরিশ্রম করতে পারে। বাইরের ব্যবহারটাকেই আমরা ধরে নিই আসল বলে। আবার ছেলে মেয়েদের মেলামেশায় দেখো। ঐ যে দেখছো জেমসকে! জেমস পাত্তা দেয় সেই সব মেয়েদের যারা স্পিরিটে স্পেনিশ আর তার অনুভূতিতে সুইডিস কিম্বা ফ্রেঞ্চ।

যে মেয়েরা এর আগে ছেলেদের সঙ্গে রাত কাটায়নি ছেলেরা ভাবে সে মেয়েগুলো একেবারে বোকা। অনেকে আবার চটুল মেয়ে না হলে ভাব জমাতেই চায় না। জেমস বলে ওই ধরনের মেয়েরা 'ডিফিকাল্ট'। ওরা নাকি জীবনের পক্ষে অচল।

আর মেয়েদের মধ্যে ভালট্রাউটকে দেখো। ঐ তো মাস ছয়েক

আগে ও আঠারো বছরে পা দিয়েছে। এ বয়সের মেয়েরা দেখবে যৌবনের স্পর্শে উদ্দাম উত্তাল। এসবে নদীতে বান ডাকার মতো থৈ থৈ করছে। একূল ওকূল দেখা যায় না। ভালট্রাউটকে কোথাও বাধা পেতে দেখবে না। ও কোথাও থামে না।

যা কিছু করবে ও বলে 'সবটাই স্পোর্ট'।

পার্টিতে গেলেই ভালট্রাউট সবার আগে এগিয়ে যাবে। গায়ে পড়ে আলাপ করবে। ঘন্টায় ঘন্টায় সিগারেটের প্যাকেট শেষ করে দেবে। ছেলেরা যে ড্রিঙ্কই দিক ওকে দেখবে টপাটপ একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছে। যতো খুশী নাচতে পার ওর সঙ্গে। ওকে বসে থাকতে দেখিনি আমি কক্ষণো।

জেমস মাঝে মাঝে ক্লান্ত হলেও ভালট্রাউটের মতো মেয়েদের পার্টনার খুঁজে নিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না।'

হয়তো ইঙ্গের কথাই ঠিক। যতো রাত গভীর হচ্ছে ভালট্রাউটের পা দুটো ভারী হয়ে আসছে।

ইঙ্গে বললো 'দেখতে পাবে ওর পায়ের চেয়ে মাথাটা বেশী ভারী হয়ে উঠবে।

আর সেটা নিজে বইতে না পেরে আস্তে রাখবে ওর পার্টনারের কাধের ওপর।'

ভালট্রাউট্ জেমসের হাত দুটোকে টেনে এনে নিজের পেছন দিকে চালান করে দিলো। ততক্ষণে ভালট্রাউট্ জেমসের কাঁধে মাথা রেখে দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে মৃদু পায়ে নাঁচছে।

ঘরের আলো বলতে কিছু নেই। সামনে থেকে সব কিছুকে ছায়ার মতো মনে হচ্ছে। শুধু কয়েকজোড়া মানুষের ছায়া ঢিমে তালের বাজনার সঙ্গে সামান্য নড়ছে। আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

জেমস জিজ্ঞেস করলো ভালট্রাউটকে 'ইজ ইট কমফরটেবল'?

ভালট্রাউট জবাব দেবার বদলে ঘাড়টা বেঁকিয়ে ঠোট দুটো এগিয়ে দিলো জেমসের দিকে।

ভালট্রাউটের অধীর ঠোঁটে জেমসের চুম্বন নিবিড় হয়ে আসে। উত্তপ্ত শরীরের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহ হয়ে থাকে তার স্পন্দন। জেমস বললো 'ভ্যাল চলো আমরা পাশের ঘরটায় যাই'।

'থ্যাটস এ গুড্ আইডিয়া'। জেমসের কোমর জড়িয়ে ভালট্রাউটের চলে যাবার দিকে তাকিয়েছিলাম।

এর পর বেশ কয়েকদিন ধরে দেখা গেলো জেমস আর ভালট্রাউট ঘুরছে এক সঙ্গে। আজকে পার্কে, অপেরায়। কাল অন্য পার্টিতে।

কিন্তু ভরা এলবের জলে সহজে টান ধরে না। জল ধরা দেবেনা অতো সহজে ভরা এলবে। যৌবনে ভরপুর। কি করে ধরবে টান। ওর মধ্যে রয়েছে অনেক কিছু ভাঙ্গার স্বপ্ন। অনেক নতুন মাটির স্বাদ নেবার অধীরতা।

জেমসের অধীনে আগ্রহ নিয়ে প্রশ্নের সহজ উত্তর। এটা শুধু জীবনের সুরু। আমার মাত্র যৌবনের সুরু। এতো সহজে সেটল হওয়া যায় না জেমস। জানোতো একটা দীর্ঘ জীবন কাটাতে হবে। ভালট্রাউট সান্ত্বনা দেয় জেমসের প্রপোজিশানের উত্তরে। 'টেইক ইট ইজি ম্যান।'

জেমস সামলে নেয় নিজেকে। নেভার মাইণ্ড বেবী। উই কেন বি গুড্ ফ্রেণ্ড। কান্ট উই?'

'ঠিক বলেছ জেমস।' জেমস ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে দেখে ভালট্রাউট নিশ্চিন্ত হলো। 'বলো লেটস হেভ এ ড্রিঙ্ক।'

ইঙ্গে বলেছিলো 'এই ভালট্রাউট একদিন শান্ত হয়ে যাবে। বয়েসটা যখন গড়িয়ে যাবে চব্বিশ কি পচিশের কোঠায় ঠিক দেখবে খুঁজে বেড়াচ্ছে কাউকে ঘর বাধার জন্য।

ভালট্রাউট হয়তো শিখবে সময় দিয়ে। জীবন দিয়ে। উপলব্ধি দিয়ে। নিজের জীবনটাকে খরচা করে অভিজ্ঞতা কিনবে। পরিতাপ হয়তো আসে কিম্বা নাও আসতে পারে সবার জীবনে। কিন্তু যার আসে? কেনা বেচার হিসেব কষতে গিয়ে যার লোকসান

হয় তার মন কি সান্ত্বনা খুঁজে পায় অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে ?

পরের রোববার হ্যামবুর্গের পরের কর্ম শিবিরে চলে এলাম। রোজবিতা এলো গাড়ী করে নিয়ে যেতে ; মালপত্র নিয়ে চলে এলাম ল্যাঙ্গেনহর্ণে।

আবার নতুন করে কর্মচঞ্চলতা। গড়ে উঠছে আরেক শিবির। সবাইকে পরিচিত হতে হবে নতুন মানুষের সঙ্গে। নতুন কাজের সঙ্গে।

এখানে আবার কাজের দায়িত্ব বেড়ে গেলো।
এ শিবিরের নেতৃত্বের ভার নিতে হলো আমাকে।

হ্যামবুর্গের এক প্রান্তে বারসবুইটেল আর অপর প্রান্তে ল্যাঙ্গেন হর্ণ। এবারের কাজের জায়গা হাইডবার্গ জেনারেল হাসপাতাল। বিকেল বেলায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো স্নান করবার জন্য। ভালো স্নানের ব্যবস্থা। হ্যামবুর্গে যা এদ্দিনে পাওয়া যায়নি।

সন্ধ্যেবেলা এলো জার্মান মেয়ে গুড্রুন মারলিস হেলডিগার ইংলণ্ড থেকে এলো জ্যানেট আর ওয়েলাস থেকে বব্। জাপানি মেয়ে ফুমিকের সঙ্গে আগেই আলাপ ছিলো। জাপান থেকে বেরিয়ে ভারতে কাটিয়ে ছিলো কিছুদিন। পরের দিন এলো দিল্লি থেকে প্রকাশ।

হাসপাতালের কাজে এমনিতে ঢোকা মুস্কিল। সব রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলো প্রত্যেকের।

সবাইকে কাজ করতে হবে হাসপাতালে অন্যান্য নার্স আর ডাক্তারদের সহকারী হিসেবে।

এখানকার হাঁসপাতাল সাধারণ জীবনের একটা অঙ্গ। ডাক্তার যদি মনে করে হাসপাতালের চিকিৎসা দরকার সঙ্গে সঙ্গে

হাসপাতলে ভর্তি হওয়া যায়। একে তাকে ধরাধরির বালাই নেই। কলের মতো কাজ এখানেও হয়। একটার পর একটা রুটিন বেঁধে কাজ।

যতো লোক দরকার তার আদ্দেকও লোক নেই। কলের মতো কাজ না করে উপায়ই বা কি! কারো সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করা আর ব্যক্তিগত কথা বলার সময় কই তার?

প্রতি সামারে আর লম্বা ছুটিতে স্বেচ্ছাসেবকরা আসে হাসপাতালের কাজকর্মে সাহায্য করতে।

মরণমুখ রোগী দেখলে প্রথম প্রথম ভয় করতো। মরে গেলে তাকে কোল্ড ষ্টোরেজে (?) রেখে দিয়ে আসতে গা ছম্ ছম্ করতো।

দুচার দিন বাদেই সরে গেলো। স্বেচ্ছাসেবকদের পুরো দলটাই তাই। দিন চারেকের মধ্যে সবার উৎসাহে যেন জোয়ার এলো।

সমস্যা একই। কারো হাতে সময় নেই। সময় ধরে সব কিছু দেবার পর ব্যক্তিগত নজর দেবার কারো ফুরসুৎ নেই।

রোগ ভালো করার সৎ চেষ্টা রয়েছে। তবে মন ভালো থাকার সঙ্গে যদি রোগ ভালো হবার কোন সম্পর্ক থাকে, গোল বাঁধছে সেখানে।

ঐ গোলযোগের ফাঁকটা দিয়ে পুরো স্বেচ্ছাসেবকের দলটা হয়ে উঠলো জনপ্রিয়।

দু' মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলেই হাতে গুঁজে দেয় সিগারেট বা চকোলেট। কখনো বা আবার পাশের আলমারী থেকে বেরিয়ে আসতো কেনিয়াক।

না নিলে একেবারে হুলুস্থুলু। জোর জবরদস্তি। নিতেই হবে।

বলছিলাম ড্রিক্সকে 'মানুষকে একটু স্নেহ মমতা আর দুটো মিষ্টি কথা বললে কতো না কি করা যায়'।

'সবই বুঝি। কিন্তু সময় কোথায় ড্রিক্সের কথার খানিকটা নিরাশার ভাব।'

ড্রিক্স এখনো চাকরি করে। ওর মতো রয়েছে এরহার্ড রোণ্টহাউস আর ক্রুন্সেস্কি।

ড্রিক্স ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো কাজের 'সেই সকালে এসে রোগীদের বিছানা ঠিক করে দেওয়া থেকে শুরু। তারপর চলতে থাকে ইউরিনের বোতল পরিস্কার করা আবার ঠিক জায়গায় রাখা। ব্রেকফাস্ট তৈরী করে সবাইকে দিতে হবে। এরই মধ্যে সুরু হবে ক্যাথিটার বদলানো। ডাক্তার আসার আগে ক্ষত ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করা। দিন গড়িয়ে চললে কাজের গতিও বাড়তে থাকে'।

ড্রিক্সকে আর বেশী খাটিয়ে লাভ নেই। সত্যি ওদের কাজের শেষ নেই। তাই প্রতি বছর এই সব স্বেচ্ছাসেবকরা এলে খানিকটা হালকা হতে পারে ওরা।

ড্রিক্স দুঃখ করছিল। 'কলকারখানায় আজকাল লোকে অনেক বেশী রোজকার করে। বেশী লোক আসতে চায়না এ সব কাজ করতে। যদি আমার কথা বলো ? আমার ভালো লাগে এ কাজ।'

ড্রিক্সকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম 'সেটাই বড়ো কথা নয় কি ? কতোজন ভালোবেসে কাজকে গ্রহণ করে বলো তো' ?

'এখন কী হচ্ছে জানো ? বেশীর ভাগ মানুষ যা করছে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সব সময়ই তার অসন্তোষ। সবাই বলছে আরো চাই' ···। ড্রিক্স উত্তেজিত হয়ে আসছিলো।

সহানুভূতি জানিয়ে বললাম 'এই আরো চাই করে করে জগৎটা কোন দিকে যাচ্ছে ক'জনা ভাবছে সে কথা বলো' ?

তেরো নম্বর ঘর থেকে ড্রিক্সের ডাক এলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। আমার ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

ভাবতে ভাবতে শিবিরে ফিরছিলাম। অন্ততঃ কিছু লোক তো সত্যিকারে মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। ড্রিক্স পৃথিবীটাকে দেখছে বেশ কিছুদিন ধরে। তাই বুঝতে পারছে জীবনের গভীরত্ব। নিজের মনে নিজের অবাক লাগে ভেবে। কলের মতো চলেছে মানুষগুলো। সব ব্যবহার সব কথাবার্তা সবটাইকি মেকি। স্নেহ দয়া মূল্যবোধ

এর সবকি মুল্য হারাবে আগামী দিনে? দেরী হল ফিরতে। ততোক্ষণে শিবিরের সন্ধ্যেবেলার জীবন সুরু হয়ে গেছে।

সবাই অপেক্ষা করতো সারাদিনের পর এই সন্ধ্যেবেলার জন্য।

হাসপাতালের নার্সরা আসতো আমাদের শিবিরে আবার কোন-দিন আমরা যেতাম ওদের কোয়ার্টারে। রোজই পার্টি, রোজই উৎসব।

জেরিস, এডিথ ক্রিষ্টা, মার্টা এলজে আর আমরা সবাই মিলে সন্ধ্যে থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত বসতো আড্ডা নাচ গান আর হৈ হুল্লোড়।

কেউ বা আবার নিজের সঙ্গী বেছে চলে যেতো শিবির ছেড়ে অন্য কোনখানে।

গুড্রুন আর এরহার্ড বেরিয়ে যেতো সন্ধ্যা হলে। বন্ধুত্ব জমে গেলো দু'জনের মধ্যে। ব্যস আর কথা নেই। সন্ধ্যে হলে এরহার্ড ওর গাড়ী করে নিয়ে যেতো গুড্রুনকে শহরে।

কোন রাতে ওরা হয়তো ফিরে আসতো না শিবিরে। আবার কোনদিন ফিরতো। সে রাতটায় এরহার্ডও থেকে যেতো শিবিরে।

সকাল বেলা দরজার পর্দাটা একটু সরে গেলে দেখা যেতো গুড্রুন আর এরহার্ড শুয়ে আছে একই বিছানায়।

সকাল বেলা তাড়াহুড়োতে যে যার কাজে চলে যেতো। বিকেলে দেখা হলে মুচকি হেসে চোখ টিপে বলতাম 'রাতে ভালো ঘুমিয়েছিলে তো ?'

'ডোণ্ট বি নটি' হাসি ফেরৎ দিয়ে জবাব দিতো গুড্রুন।

তামাসা করতে ছাড়তো না গুড্রুন। উল্টে প্রশ্ন করতো 'ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, ডু ইউ ?'

'আমার মনে করা নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে বলো ? আর মনে করলেই তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে ?'

সামান্য হেসে গুড্রুন জবাব দিল 'তোমার সব কিছুতেই একটা দর্শন। ও সব ছাড়ো এখন মজা করার সময় মজা করে নাও। পরে পস্তাবে'।

,জবাব আমিও দিতে ছাড়তাম না। 'কে বললো তোমায় মজা করছি না? তোমার সঙ্গে মজা করছি না বলে তাই ভেবোনা।'

'দ্যাট'স্ বেটার'। টুক করে জবাব দিয়ে গুড্রুন বেরিয়ে যেতো।

এই শিবিরে রোজ রোজ আলোচনা আর মিটিং লেগে থাকতো না। সন্ধ্যেগুলো প্রত্যেকের নিজের পছন্দ মতো কাটানো যেতো।

সন্ধ্যেবেলার আসরে এলজে আসতো। সদ্য ঘুরে এসেছে স্পেন থেকে।

গায়ের রঙ্ তখনো পুরো বাদামী। পয়সা খরচ করে গায়ের রঙ্ বদলাতে হয়েছে। তেল মেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে শুয়ে তবে যদি একটু চামড়ার রঙ্ বদলানো যায়। ওকে দেখতে ভালো। তার ওপর গায়ের রঙ্ বাদামী হওয়াতে আরো বেশী আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে এলজেকে। এলজেও সচেতন ছিল সে সম্পর্কে।

একদিন প্রকাশ এসে বলেছিল আমাকে। প্রকাশের সঙ্গে এলজের আলাপ হবার আগে হাসপাতালে কাজের মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখত প্রকাশের দিকে। প্রকাশ খানিকটা আবেগে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল এলজেকে 'ভাস ইস লোস'। বোধহয় ভাবটাছিল এতো হাঁ করে কি দেখছ!

'গা নিকস'। এলজে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে অন্যদিকে সরে গেল।

প্রকাশের সঙ্গে এলজের আলাপ ঘনিষ্ঠ হবার পর ব্যাপারটা খুলে বলেছিল। এলজে আড়চোখে প্রকাশের দিকে দেখতো যে ওর গায়ের রঙ্ বেশী বাদামী না প্রকাশের! স্পেনে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে ও ভেবেছিল পুরো বাদামী হয়ে গেছে। হাসপাতালে ফিরে এসে প্রকাশের গায়ের রঙে্র সঙ্গে তুলনা করে এলজের হিংসে

হাসপাতালের নার্সদের সঙ্গে শিবির কর্মিদের তখন ভাব জমে উঠেছে। সপ্তাহ কয়েক বাদে আমরা নার্সদের আর হাসপাতালের সহকর্মিদের নেমতন্ন করলাম আমাদের শিবিরে।

প্রকাশের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল এলজেকে নিয়ে

আসার। বিকেল বেলা প্রকাশ খুব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল 'এলজে কাঁদছে'।

'তা আমি কি করবো'? বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করার আছে এতে। প্রকাশকে বললাম 'তুমি গিয়ে সান্ত্বনা দাও'।

সন্ধ্যেবেলা সবাই মিলিত হয়েছে লাউঞ্জে। আওয়াজ পাচ্ছিলাম পার্টি দারুণ জমে উঠেছে। কেন জানিনা লোকের ভিড় ভাল লাগছিল না। নিজের ঘরে বসে ভাবছিলাম গত কয়েক মাসের একটার পর একটা ঘটনার কথা। ঘটনাচক্রে কতো কিছু বদলে গেছে। একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করতাম ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য।

কল্পনা করবার চেষ্টা করতাম ভবিষ্যতের দিনগুলোর। সামনে শুধু অন্ধকার। বেশীদূর ভাবতে পারছি না।

দরজায় কে যেন বেল দিল। দরজা খুলে দিতেই প্রকাশ ঘরে ঢুকে চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল। ওর চেহারা দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। 'কি ব্যাপার এরই মধ্যে ফিরে এলে'?

প্রকাশ কোন জবাব দিল না। খানিকটা কথাবার্তা বলার পর ওর কাছ থেকে বুঝতে পারলাম এলজের কথায় প্রকাশের অভিমান হয়েছে।

এলজেকে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল, ত্নপুরবেলা ও কাঁদছিল কেন। এলজে জবাব দেয় নি।

প্রকাশের ঝিমনো ভাব ভাল লাগছিল না। ওকে নিয়ে পার্টিতে চলে এলাম। এলজের সঙ্গে নাচার সময় বললাম 'প্রকাশ তোমার ওপর অভিমান করে বসে আছে। এলজে আমার কথা শুনে একেবারে অবাক। ও মনেই করতে পারছে না 'প্রকাশকে আঘাত করবার মতো কিছু বলেছে কিনা'!

বেশ কিছুক্ষণ পরে এলজে আমায় বললো 'প্রকাশ কি যেন জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। আমি তার জবাব দিই নি'।

অনেক চেষ্টা করে এলজের কাছ থেকে জানতে পারলাম ওর

ফ্রকের ঘাড়ের দিকের কয়েকটা বোতাম খোলা ছিল। তাই নিয়ে হাসপাতালের মেট্রনের কাছে বকুনি খেয়েছে। এলজের মুখ ভার দেখে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জবাব পায় নি।

প্রকাশ পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। আগ্রহ চাপতে না পেরে জানতে চাইল 'তোমাদের দেশে এ সমস্ত নিয়ে লোকে মাথা ঘামায়' ?

প্রকাশের প্রশ্নে এলজে উৎসাহ পেয়ে মেট্রনের নামে এক রাশ গাল দিয়ে তার অতীত জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু বলে গেল।

সামান্য ব্যাপার অনেকদূর গড়াচ্ছে। বাধা দিয়ে বললাম 'নেভার মাইণ্ড। ও সব ভুলে যাও। এখন মজা করো'।

সবাই মিলে ততক্ষণে পার্টি বেশ জমিয়ে তুলেছে।

নাচছে এলজে আর প্রকাশ। সুন্দর নাচে এলজে। ওর নাচার ভঙ্গিটা অন্যদের চেয়ে বেশ একটু আলাদা। নাচছে সবাই তবু অনেকের মধ্যে ওকে ঠিক চোখে পড়ে। নাচার ভঙ্গিতে রয়েছে উদ্দীপনা। যৌবনের উচ্ছ্বাস।

প্রকাশ আর এলজে কোমর জাপ্টে ধরে নাচছে। মাঝে মাঝে প্রকাশ আদর করছিল এলজেকে।

গানে সুরে বাজছে 'লাভ মি টেণ্ডার। লাভ মি মোর…'

এলজে, প্রকাশ, গুড্রুন, এরহার্ড গানের কথাগুলোকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করছে। যেন মিথ্যে না হয়ে যায় এ ক্ষণটুকু। এই মুহূর্তটা নিবিড় হবার। আরো কাছে। আরো ঘনিষ্ঠ হবার।

ঘরের আলো কমিয়ে দিলো মারলিস। সবাই একসঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ করে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো। এর অপেক্ষাতেই যেন ছিল সবাই।

নাচের পার্টনাররা তালে তালে একে অন্যের উত্তপ্ত দেহকে অনুভব করতে চাইছে। এলজে প্রকাশের কাঁধে মুখ গুঁজে ছিল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে প্রকাশকে চুমু খাচ্ছে। প্রকাশ মৃদু হেসে এলজের মুখটা তুলে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে চুমু খেলো এলজেকে।

নাচতে নাচতে ওদের পাশে এলো ডাঃ টিবো। ডাঃ টিবোকে পাশে দেখে এলজে ডান হাতে ঠোঁট ছুঁয়ে একটা চুমু ছুঁড়ে দিলো টিবোর দিকে।

এলজে ডাঃ টিবোর দিকে চুমু ছুঁড়ে দিতে প্রকাশের চিন্তায় ধাক্কা লাগলো।

'কি ব্যাপার?'

এলজে হো হো করে হেসে উঠলো। 'কেন তোমার হিংসে হচ্ছে'?

প্রকাশ তৈরী ছিল না এমনি একটা চোখা প্রশ্নের জন্য। কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে প্রকাশ হেসে ফেললো।

এলজে প্রকাশের কানে আস্তে করে একটা কামড় দিয়ে বললো 'তোমার হিংসে করার কোন কারণ নেই। ডাঃ টিবোর বৌকে দেখিয়ে চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম টিবোকে ক্ষ্যাপাবার জন্য'।

প্রকাশ এবার স্বাভাবিক হয়ে এল। ফিস্ ফিস্ করে বললো 'এলজে তুমি স্পেন থেকে শুধু গায়ের রঙ্ই বদলে আসনি, খানিকটা স্পেনিশ স্পিরিটও সঙ্গে করে বয়ে এনেছো।'

হাসির ধমক চাপতে না পেরে এলজে আরো জোরে জাপ্টে ধরলো প্রকাশকে।

প্রকাশ দুহাতে এলজের থুঁতনিটা ওর দিকে তুলে ধরে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেলো।

পার্টি কখন ভেঙেছিল ঠিক সময়টা কারো মনে পড়েনি। পরের দিন রোববার ছিল তাই মনে পড়বার দরকার ছিল না।

আমার দরকার ছিল। এক বিশেষ আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল আমাদের শিবিরে। 'রুডলফ্ ষ্টাইনার' স্কুলের মাষ্টার মিঃ বুকহার্স্ট এলেন আমাদের সঙ্গে অলোচনা করতে।

অমায়িক লোক। প্রথম আধ ঘণ্টার আলাপে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সব অভিমান ভেসে গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে কথা বলে

বক্তৃতা দিলেন জার্মানীর 'রুডলফ্ ষ্টাইনার' স্কুল ব্যবস্থা সম্পর্কে। ঐ ধরনের স্কুলে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে শেখানো হয় পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের দর্শন। বিশ্বের বহু দেশের ইতিহাস আর পৌরাণিক কাহিনী। পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থা থেকে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার বিষয়, সব কিছু রাখা হয়েছে এদের পাঠ্যক্রমে।

হের বুকহার্ষ্ট বললেন ঐ স্কুলগুলোতে পড়ান হয় সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের জার্মান অনুবাদ। ভারতীয় ইতিহাস আর দর্শন। আধুনিক জার্মানীতে সত্যিকারের মানুষ গড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন হের বুকহার্ষ্টের মতো কয়েকজন লোক।

স্কুলগুলোর সমস্যার কথাও বললেন। অতিরিক্ত খরচ পড়ে এ ধরনের শিক্ষার জন্য। অনেক বাবা-মা ইচ্ছে থাকলেও ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে পারেন না ঐ স্কুলগুলোতে।

হের বুকহার্ষ্ট বলছিলেন 'এ হলো জীবন্ত শিক্ষা। শিক্ষায় প্রাণ না থাকলে সে শিক্ষা কখনো জাতি গড়তে পারে না।'

লেঙ্গেনহর্ণের শেষের দিনগুলো রক্তরাগে রাঙা। আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। নিজেকে হারিয়েছিলাম। হারিয়েছিলাম গভীর জীবনবোধের স্বাদ নিতে গিয়ে। জীবনের অতল তলে ডুব দিয়ে মণি মুক্তা পাইনি। পেয়েছিলাম এডেলট্রাউটকে। রক্তরাগ সৃষ্টি করেছিলো এডেলট্রাউট।

নিঃসম্বল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ইওরোপে এসে আমার সম্বল ছিল আন্তরিকতা। সবার সঙ্গে মিশেছি। বন্ধুত্বও করেছি প্রাণখুলে। গভীরভাবে সম্পর্ক গড়তে চাইনি। পেছনের টানে বাধা পড়ার মতো সম্বল নেই। সহায় নেই।

লেঙ্গেনহর্ণে এসে হাসপাতালের নার্সদের মধ্যে আলাপ জমেছিলো বেশী ইয়োহানার সঙ্গে। ইয়োহানা সিনিয়ার নার্স। প্রায়ই আমাদের নেমতন্ন করে নিয়ে যেতো ওর কোয়ার্টারে।

ইয়োহানার ঘরে প্রথম দেখেছিলাম এডেলট্রাউটকে। এডেল-ট্রাউট ইয়োহানার খুব ছোট বেলার বান্ধবী। বকুল সই। পুতুল খেলার সই।

তুজনের জীবনের গতি আলাদা। ইয়োহানা বড় হয়েছে প্রাচুর্যে ভালবাসায় এডেলট্রাউট ঠিক তার উল্টো।

প্রথম দিন দেখে ভীষণ লাজুক মনে হয়েছিলো এডেলট্রাউটকে। ইয়োহানার ঘরের অল্প আলোয় ওকে প্রথম দেখেছিলাম। ওর মুখে কোথায় যেতো লুকিয়ে আছে বেদনা তবু চোখ তুটো খুশিতে ভরা।

ওর দৃষ্টি স্বচ্ছ। ভাবালুতা নেই। ব্যবহারে সম্ভ্রম আছে জড়তা নেই।

একঘর লোকের মধ্যে এডেলট্রাউটকে দেখলে ওকে আগে চোখে পড়বে। ও নিজেকে জাহির করতে চায় না। তবে ওরদিকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে উপায় নেই। এডেলট্রাউট স্বাভাবিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবার আগে।

ইয়োহানার ঘরে ওয়াইন খেয়ে যাচ্ছিল একটার পর একটা। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওর ওয়াইন খাওয়া দেখে। নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'তোমার খারাপ লাগেনা বেশী ড্রিঙ্ক্ করলে' ?

ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃতু মৃতু হাসছিল।

এডেলট্রাউটের সঙ্গে কথা বলতে জার্মান ভাষা শেখার তাগিদ আরো বেশী করে অনুভব করলাম।

সারা সন্ধ্যে পাশে বসে যাবার পরও কোন কথা বলে নি। সবাই উঠবো উঠবো করছি এডেলট্রাউট আমার অনুরোধ করলো বসতে।

'অনেক রাত হোল বলে কাজ আছে' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে এগুতে পারলাম না। আবার বসে পড়লাম এডেলট্রাউটের পাশে।

সবাই ফিরে গেছে শিবিরে। ঘরে ইয়োমানা এডেলট্রাউট আর আমি রয়েছি।

সারা সন্ধ্যের পর এডেলট্রাউট প্রথম কথা বললো। 'বাঁশী শুনবে?'

শরীরের সব জড়তা কাটিয়ে বললাম 'তুমি যদি বাজিয়ে শোনাও নিশ্চই শুনবো।'

ইয়োহানার বুক সেল্‌ফের পেছন থেকে বার করে নিয়ে এলো বাঁশী আর স্বরলিপি বই।

দু' তিনটে সুর বাজাবার পর এডেলট্রাউট আমায় বললো। এবারে তোমার পালা। গান গেয়ে শোনাও। ইয়োহানা বলেছে তুমি খুব ভালো গান করো।

লজ্জা পেলাম। 'দেখো এদেশে আমার গানের সুর তাল ভুল ধরার লোক নেই তাই সাহস করে গাই। দেশে হলে কুকুর লেলিয়ে দিতো।'

একটা। দুটো। অনেক। অনেকগুলো গান গেয়ে শোনলাম। রাত কটা বাজলো খেয়াল ছিলো না। কাল কাজে কি হবে সে কথা মনে আসে নি। রোজইতো ঘুমোই একদিন কম ঘুম হবে তাতে আর কি!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবাক হয়ে শুনছিলো এডেলট্রাউট। ওর চোখ দুটোকে আরো উজ্জ্বল দেখাছিলো। ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাষা বোঝে না। সুর বোঝে না। তবুও যেনো সবটুকু রস সমস্ত আগ্রহ দিয়ে নিঙড়ে নেবার চেষ্টা করছে গানের ভাবকে।

বার বার বলতে হয়নি গান করতে। ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমি নিজেই অনুপ্রাণিত হচ্ছিলাম গান গাইতে। হয়তো বুঝেছিলাম ভালো যদি সত্যি লাগে মুখে বলে দেবার দরকার নেই। গান গাইছিলাম আমার নিজের আনন্দে। এডেলট্রাউটের মুখে স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দের রেখার ইশারা, আনন্দের উৎস।

এডেলট্রাউট বলেছিলো 'বাংলা গানের সুর মানুষকে শান্ত করে দেয়। এ সুর ভাসে সমস্ত দেহময়। এ সুর পৌঁছয় অন্তরে।'

ধন্যবাদ দেবার, লোক ঠকানোর চেষ্টা করিনি। শুধু জিজ্ঞাসা

করলাম 'তোমার ভালো লেগেছে ?'

এডেলট্রাউটের চোখে সেই হাসি। ঠোঁটের ফাঁকে ওর দাঁত দেখা যায় না। ওর ভাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে ওর খুশী। সমস্ত মুখটা হয়ে উঠেছে উদ্ভাসিত।

ইয়োহানাকে গুড্‌নাইট করে আমি আর এডেলট্রাউট যখন বেড়িয়ে এলাম রাত আর বাকী নেই।

এডেলট্রাউটের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম রাতটা শেষ হয়ে গেলো।

তারপর বহুদিন খবর পাইনি এডেলট্রাউটের। দু একবার খবর নেবার চেষ্টা করেছি ইয়োহানার সঙ্গে হঠাৎ এলো এডেলট্রাউট। আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির।

অভ্যর্থনা করলাম। সেদিনের পরে আর আসেনি বলে অনুযোগ করবার অধিকার নেই। তাই অনুযোগ থেকে বিরত রইলাম।

শুধু হেসে বলেছিলাম 'তোমার সঙ্গে রোজ নতুন করেই পরিচয় করতে চাই।'

এবারে না হেসে পারেনি। এডেলট্রাউট হাসলে ওর বেদনার ছায়া সরে যায় মুখ থেকে। সমস্ত মুখটা আনন্দে আলোকিত হয়ে ওঠে।

ওর হাসির প্রসংশা করে বললাম 'তুমি হাসলে মনে হয় সত্যিই অন্তর থেকে হাসছো। সরল তোমার হাসি।'

আমার কথা থামিয়ে দেবার জন্য ওর হাত উঠে এসেছিলো। আমার মুখে চাপা দিয়ে দিলো ওর হাত দিয়ে।

'ও কথা বলো না। আমি যখন হাঁসি আমি নিজেই লজ্জা হাসতে।' বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

'তবে সে কথা থাক মাঝে মাঝে আসবে তো আমাদের এখানে ?'

জবাবে এডেলট্রাউট জানালো বহুদূর থেকে সাইকেলে করে ও আসে। এখানে এলেই অনেক রাত হয়ে যায়। ফিরতে দেরী হয়। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন যেতে হয় ইংরেজী শিখতে শহরে। আর দুদিন চার্চের অর্গান বাজানো শেখে।

কথায় জের টেনে এডেলট্রাউট বললো 'রোজ নতুন করে পরিচয় করবার দরকার হবে না। সময় পেলেই বলে আসবো তোমাদের এখানে।'

এর পরের দিনও এডেলট্রাউট্ এলো। সঙ্গে ইয়োহানা। ইয়োহানা আমাকে বললো 'তোমার জন্য এডেলট্রাউট্ ছুটো জার্মান ফোক সঙ্গসের বই আর স্বরলিপি এনেছে। ও তোমাকে দিতে চায়'।

মুগ্ধ হয়েছিলাম ওর উপহার চয়নে। হাজারো কিছু ফেলে 'লোক সঙ্গীত' আমাকে উপহার দেবার পেছনে ওর সেই উদাস মনটা যেন ধরা পড়ে গেল।

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম এই অজাচিত অনুগ্রহ কেন? কোন জবাব সেদিন খুঁজে পাইনি!

গানের জন্য ধন্যবাদ এডেলট্রাউট্ দেয়নি। ধন্যবাদ আমিও দিইনি। আমায় দৃষ্টির কৃতজ্ঞতায় পৌছে দিয়েছিলো সে জবাবটুকু এডেলট্রাউটের কাছে।

কারণ জেনেছিলাম দিন কয়েক বাদে। হাসপাতালের সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম আমাদের শিবিরে।

বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো আন্তর্জাতিক সমাজসেবী সংস্থার আদর্শ সবার কাছে তুলে ধরা। অনেকে জানতে চেয়েছে 'কারা এই স্বেচ্ছাসেবী'? সেদিন বহু লোকের জমায়েত আমাদের শিবিরে। প্রথমে বক্তৃতা। তারপর প্রশ্ন। আর তার উত্তর দিতে হচ্ছে আমাকে।

ভারতের জনসংখ্যা রোধ করবার জন্য আমরা কি করছি? লোকে না খেয়ে মরে অপুষ্টিতে ভোগে তবু সংসারের জন্য নিষিদ্ধ আমিষ আহার করে না কেন?

মানুষের এতো দুঃখ দুর্দ্দশা সত্ত্বেও তবু সাধারণ লোক অন্যের কাছ থেকে কেড়ে খায় না কেন?

অবাক হলাম শেষের প্রশ্নে।

সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলাম, 'ওইটুকুই আমাদের সম্বল। প্রাচুর্য নেই। সম্পদ সীমিত। আছে শুধু আত্মবিশ্বাস। আত্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভগবানে বিশ্বাস। আর তাতেই বেঁচে থাকতে চায় ভারতের অগণিত জনতা। হয়তো সেটুকুই আমরা দেবো আগামীদিনের বিশ্বকে।

মাদ্রাজের আর্চবিশপ মাথায়সের উনিশশো চৌষট্টি সালের উক্তি উল্লেখ করে বললাম 'ইণ্ডিয়া উইল বি ইউজড্ টু বেস্টোর গড্ টু ইওরোপ'।

ঘর ভরতি লোক ক্ষণেকের তরে সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিলো। আলোচনা আর প্রশ্নের ঝড় যেন অনেকটা থেমে গেল। এ বৈঠকে যোগ দিতে রোজবিতা এসেছিল।

অকস্মাৎ চুপ চাপ দেখে রোজবিতা জিজ্ঞাসা করলো প্রকাশকে। শুনেছি তুমি যোগ আসন করতে জানো। কই আমাদের দেখাও'।

প্রকাশ তু'একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু ইতঃস্ততঃ করছিলো।

ইশারায় বললাম 'যে কটা জানো দেখিয়ে দাও'।

প্রকাশ পাশের ঘর থেকে তৈরী হয়ে এলো।

গোটা দশেক যোগ আসন দেখালো।

সবাই অবাক বিস্ময়ে হা করে দেখছে কি করে প্রকাশ হাঁটু ভাঙ্গছে আর সমস্ত শরীরটাকে গোল করে পাকিয়ে ফেলেছে।

আসন দেখানো শেষ হলে তু'চার জন এগিয়ে এসে প্রকাশের হাঁটু হাত পা টিপে দেখলো কোথাও ভেঙ্গেছে কিনা।

অনেক রাতে বৈঠক ভাঙ্গলো। তারপর শুরু হলো আমাদের দৈনন্দিন পার্টি। ইয়োহানা, এডেলট্রাউট, মারলিশ, এলজে প্রকাশ, বব্ আর আমি।

অনেকগুলো রেকর্ড নিয়ে এসেছে এলজে। প্রকাশ হচ্ছে আমাদের ডিস্ক জকি। একটার পর একটা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছে।

চড়া সুরের বাজনার তালে নাচ শুরু হলো। প্রকাশ এলজের

সঙ্গে। বব্ মারলিসের সঙ্গে। গুড্রুন এরহার্ডের সঙ্গে নাচছিলো। এডেলট্রাউট্ কোনায় বসেছিলো।

সারা সন্ধ্যের বিকলে পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। এডেলট্রাউট্ মৃদু মৃদু হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'নাচতে ইচ্ছে করছে তোমার' ?

এডেলট্রাউট দুটো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আস্তে হাল্কা টানে ওকে তুলে নিলাম।

সুন্দর নাচতে পারে এডেলট্রাউট্। 'কি ব্যপার ? তুমি এতো ভালো নাচতে পারো অথচ চুপ করে বসেছিলে এতক্ষণ' ? কথার জবাব দিলো না এডেলট্রাউট্। একবার বললো 'তোমার ডান পাটা ভুল ফেলছো'।

দু'কদম সরে গিয়ে দেখিয়ে দিলো কি করে ট্যাংগো নাচতে হয়।

রাত বাড়ছে। তবু কারো খেয়াল নেই। কাল সকালের কথা আজ আর কেউ চিন্তা করছে না।

গানের সুরে বাজছে 'রেষ্ট ইয়োর হেড্ অন মাই সোল্ডার। কিস মি ওয়ান্স বেবী'।

সত্যি তাই। সবাই নাচছে কাঁধে মাথা রেখে। অদ্ভুত মাদকতা। কর্মমুখর মানুষগুলো কেমন নিস্তেজ হয়ে কলের পুতুলের মতো একে অন্যকে ভর দিয়ে হাল্কা পায়ে নেচে চলেছে।

এডেলট্রাউট ওর মাথা রেখেছে আমার কাঁধে। এডেলট্রাউটকে কাছে পেয়ে ভালো লাগছে। লেপ্টে আছে এডেলট্রাউট আমার শরীরের সঙ্গে। ওর নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পরিষ্কার টের পাচ্ছি। ওর নাকের ঠাণ্ডা ডগাটার স্পর্শ লাগছে আমার ঘাড়ে। আমার বেদনা দিয়ে আরো কাছে পেতে চাইছি এডেলট্রাউটকে।

রেকর্ডটা শেষ হয়ে গেলো। প্রকাশ আবার চালিয়ে দিলে সেই রেকর্ডটাকেই।

খানিকটা বাদে এডেলট্রাউট আমার কানের কাছে মুখ এনে

ফিস ফিস করে বললো 'শুধু আমার সঙ্গে নাচছো কেন? আর কারো সঙ্গে নাচতে চাও না'?

'তোমার সঙ্গে নাচতে ভীষণ ভালো লাগছে।' 'তোমার সঙ্গে নাচার চেয়েও তোমার স্পর্শকে ভালো লাগছে। তোমার দু বাহুর মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে।'

কথার জবাব দিলো না এডেলট্রাউট্। আমার দুটো হাতে জোরে চাপ দিয়ে ও জানালো ওর খুশীর ভাব। ঠোঁটের কোণায় সেই ভাবটা আবার উঁকি মারছে। ও খুশী হয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায় ওর সেই বেদনার ভাবটা।

এডেলট্রাউটের এবারে সত্যি লজ্জা করছিল। আবার আমার কানে কানে বললো 'না' এটা কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না। শুধু আমার সঙ্গে নাচলে তোমায় লোকে কি বলবে। এ গানটা শেষ হলে ইয়োহানা আর বারলিসের সঙ্গে নাচবে, বুঝলে'? কথায় অধিকারের সঙ্গে আদেশের সুর লক্ষ্য করে আর এড়াতে পারিনি।

ইজ ইট প্লিজ। কিন্তু তোমার খারাপ লাগছে কেন। কই অন্যেরা তো এ নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছে না।

বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বললো 'তুমি এ শিবিরের লিডার। তোমার উচিৎ সবাইকে কোম্পানী দেওয়া'।

জবাব জিতে পারলাম না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম এডেলট্রাউটের দিকে। ভেতর থেকে অভিমান জাগেনি। ভেতরে ভেতরে বল পাচ্ছি। এ কথা ভেবে এডেলট্রাউট কতো গভীরে চিন্তা করছে। ওর কাছে আমাকে যেনো কতো ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

গানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচলাম এলজের সঙ্গে। মারলিসের সঙ্গে আর ইয়োহানার সঙ্গে।

সত্যি বদলাচ্ছি অথচ মন পড়ে থাকছে এডেলট্রাউটের দিকে। বার বার এডেলট্রাউটের দিকে নজর পড়েছে। প্রতিবার আমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়েছে ওর সেই প্রাণ জুড়োনো হাসি দিয়ে।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত আড়াইটে বাজে। কারো কোন

খেয়াল নেই। পার্টি ভাঙার কথা ভাবলাম। কিন্তু কাজে পরিণত করতে পারলাম না। ফিরে গেলাম এডেলট্রাউটের কাছে।

বললাম 'এবার তোমার সঙ্গে নাচতে পারি তো'।

'সব সময় পারো।' আমাকে ভুল বুঝোনা তোমায় সরিয়ে দিইনি। তোমাকে লোকে কিছু বললে সেটা আমার খারাপ লাগবে যে।

কথাগুলো বলেই এডেলট্রাউট তাকিয়েছিলো আমার মুখের দিকে। প্রগাঢ় ওর দৃষ্টি। সবটুকু নজর দিয়ে আমায় বিচার করতে চাইছে।

কি বলবো ভেবে না পেয়ে বললাম 'অতো করে দেখছো কি'?

নাচের তালে তালে ঘুরে গেলো এডেলট্রাউট। আমার ঘাড়ে মুখ রেখে নাচছে এডেলট্রাউট। নাচার ছন্দে ছন্দে আমার শরীরটাকে জড়িয়ে নিচ্ছিলো ওর শরীরের সঙ্গে। ওর দুটো হাত দিয়ে নিবিড় করে বেঁধে রেখেছে আমাকে ওর সঙ্গে।

শরীরের চেতনার বাইরেও অনুভব করছিলাম ওর মনকে। স্পর্শ করতে চাইল ওর সেই গভীর মনটাকে। বার বার ভেবেছি ওকে একটা কথা বলি। তবু বলতে পারিনি। যদি ব্যর্থ হই! যদি আমার আবেগ রুদ্ধদ্বারে বাধা পেয়ে ফিরে আসে।

একসময় নাচতে নাচতে আমরা ঘরের কোণের দিকটায় চলে এলাম।

ভেতরের আবেগ বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারলাম না।

বাঁ হাতে জড়িয়ে আছি এডেট্রাউটকে। ডান হাতে ওর মুখটা তুলে ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম তোমার ঐ গভীর দৃষ্টি দিয়ে কি খোঁজ বলতো? কাউকে ভালোবেসে…। আমার মুখে ওর হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিলো।

ভাবান্তর ঘটেনি এডেলট্রাউটের মুখে। চোখের পাতা পড়েনি। থামেনি ওর নাচ। ও যেন প্রস্তুত ছিল। আমি যে কিছু বলার জন্য উসফুস করছি তার বার্তা পৌছে গিয়েছিল ওর কাছে।

ঘাড়টা ঘুরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো। 'ডি পি ভালোবাসা কাকে বলে আমি ঠিক জানিনা। সত্যি বলছি আমি জানিনা আমি কাউকে ভালোবেসেছি কিনা। আমি ভালোবাসতে ভয় পাই।'

এডেলট্রাউটের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। রুদ্ধ কান্নায় ওর নাকের ডগা লাল হয়ে উঠলো।

বুঝতে না পেরে বললাম আমি কি তোমায় দুঃখ দিলাম? আমায় ক্ষমা করো হয়তো না বুঝে দুঃখ…।

দু'হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিলো আমার মুখে। কথা শেষ হলো না। কিছু শুনতে না চাইলেও বিরক্তি দেখায় না। আস্তে করে ওর হাত দিয়ে মুখে চাপা দিয়ে দেয়। হাতের পেছন দিয়ে চোখ মুছে রুদ্ধ আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ওর গালের সঙ্গে আমার গাল লাগিয়ে আবেগ প্রকাশ করতে চাইলো।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। এডেলট্রাউট তাকাতে পারছিল না ওর দিকে। হয়তো ওকে দুঃখ দিলাম। কথা বলার জন্য মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। 'সব ভাব কথায় প্রকাশ করতে নেই।' 'কেন?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম 'মনের ভাব কথা হয়ে যদি মিথ্যে হয়ে যায়।'

'পৃথিবীটাকে মিথ্যে ভাবো কেনো?' ভালোবাসা কাকে বলে আমি ভুলে গেছি। মনের ভেতর তোলপাড় করলেও ভালবাসি একথা বলতে পারি না। যতক্ষণ ভেতরে থাকে ততক্ষণই তো প্রেম। আমার ভয় হয়। বলে ফেললেই বোধহয় প্রেমের শেষ হয়ে গেলো। আমার জন্য এই যে তোমার আবেগ উৎকণ্ঠা এটাকে শেষ হতে দিওনা ডি পি। আমার ভীষণ ভালো লাগছে ভাবতে। সত্যি বলছি এখনো আমি ভালোবাসতে চাই। আমি ভালোবাসা চাই।

প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম এডেলট্রাউটকে। আমায় কথা বলতে দিলো না। 'না আর কোন কথা বলো না। সব বলবো তোমাকে।

তবে আজ কোন প্রশ্ন নয়। তোমার সঙ্গে আমাকে নাচতে দাও।' বিরক্ত হতে পারিনি। হয়েছি অবাক। একবার মনে হলো আরো মেয়েদের মতো এডেলট্রাউটও রহস্যময়ী।

সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ পেয়ে বুঝলাম এডেলট্রাউট এসেছে তৈরী হয়েছিলাম। দরজা খুলে বললাম 'সাইকেলটা ভেতরে রেখে দাও।'

গতরাতের কথা মনে করে নতুন করে দেখছিলাম ওকে। এডেলট্রাউট স্বাভাবিক। সেই স্বচ্ছ হাসি।

ভেতরে এসে আলতো করে আমার গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'কি এখনো তৈরী হওনি?'

কাল কথা হয়েছিল ও আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবে ল্যাঙ্গেন-হর্ণের অন্যদিকটা।

'এক মিনিট বসো, এক্ষুণি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

এডেলট্রাউটকে সামনের ঘরটায় বসিয়ে আমি ভেতরে চলে এলাম জামা কাপড় পরবার জন্য।

এডেলট্রাউটের সঙ্গে যখন বেরোলাম ল্যাঙ্গেনহর্ণে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করেছে। তবু এ সময়টা যেন ঠাণ্ডার আমেজটা ভালো লাগে। বরফ গলানো ঠাণ্ডা নয়। অথচ ভালো ভাবে গরম জামা কাপড় পরে থাকলে ঠাণ্ডাটা বেশ উপভোগ করা যায়।

অনেকটা পথ হেঁটে আমরা এসে বসলাম একটা পার্কের বেঞ্চে। এডেলট্রাউট হাত দিয়ে দেখালো কিছুদূরের একটা হাসপাতালকে।

এডেলট্রাউট ওখানে কাজ করে। এ জায়গাটার নাম অকসেন-সোল। অকসেনসোলের হাসপাতালে সিনিয়ার নার্স এডেলট্রাউট।

'ইয়োহানা আর আমি ছোটবেলা থেকে ঠিক করেছিলাম আমরা নার্সিং পড়বো।'

মাঝখানে প্রশ্ন করেছিলাম কেন? কোন বিশেষ কারণ ছিলো কি?

'না ঠিক তা নয়। আমার আর বেশী কিছু করার যোগ্যতা ছিলো না।'

ঠাট্টা করে বললাম, 'কি লেখা পড়ায় খারাপ ছিলে?'

'না পড়াশুনো করতে ভয় পেতে?'

'লেখাপড়া মোটামুটি বুঝতাম। তা নয়। টাকা পয়সা ছিলো না। আর উৎসাহ ছিলো না। কারো উৎসাহ পাই নি।

'তোমার বাবা কি করতেন?' এডেলট্রাউট উদাসভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বচ্ছ সোজা দৃষ্টি কেমন যেন বেদনায় ভরে এলো।

আমি নিজে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'তোমার কোথাও আঘাত দিয়েছি কি?'

সারা মুখের বেদনা ছাপিয়ে এডেলট্রাউট হেসে উঠলো 'ভগবান যাকে বেদনার মধ্যে জীবন দিয়েছেন তুমি আর তাকে কতো আঘাত দেবে! আমার বাবাকে কোনদিন দেখিনি আমি।'

কথাটা বলে এডেলট্রাউট থেমে গেলো। তাকিয়ে আছে দূরে অকসেনসোলের হাসপাতালটার দিকে।

সেদিকে তাকিয়েই এডেলট্রাউট বললো 'আমার জ্ঞান হবার আগেই মা-ও মরে গেলো।'

তখন আমার বয়েস পাঁচ কি ছয়। মা'র মুখটা ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু মনে আছে মা লম্বা ছিলেন। পেছনে খোপা করে চুল বাঁধতেন। চুল বাঁধার কথাটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রায়ই আমাকে দু'হাঁটুর মধ্যে রেখে আমার চুলের জট ছাড়াতেন।'

অন্ধকারে এডেলট্রাউটের মুখটাকে আরো গম্ভীর মনে হচ্ছে। ঠোঁটটা চেপে রাখা সত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'জানো ডি পি মা চলে যাবার পর থেকে স্নেহ মমতা দয়া কোন্ কিছু পাইনি আমার জীবনে।'

সন্ধ্যেবেলার আবহাওয়াটা শীতের কুয়াশার চেয়ে ভারী হয়ে উঠেছে। এডেলট্রাউটকে একটু হাল্কা করবার চেষ্টা করলাম।

'এতো কথা বললে, দেখো তোমার বয়েসটা জানা হয়নি আমার।'

না হেসে পারে নি এডেলট্রাউট। 'জানো না মেয়েদের বয়েস সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে নেই।'

এডেলট্রাউটের জীবনে বাইশটি শীত পেরিয়ে গেছে।

'ইওরোপের শীতের বেদনাময় ইতিহাসের মতোই আমার জীবন ভরে রয়েছে বেদনা আর হতাশা। শীতের শেষে বসন্তের ছোঁয়া পাবার জন্য হাত বাড়িয়েও শূন্য হাতে বার বার ফিরে এসেছি।'

'বাবা মাকে হারিয়েছি ছোটবেলা। ভাই বোন কেউই ছিলো না। যার কাছে আবদার নিয়ে দাঁড়াতে পারি কেউ ছিলো না।'

মা মরে যাবায় পর দূর সম্পর্কের এক ঠাকুমা নিয়ে গেলেন তার কাছে। পরে বুঝেছিলাম ঠাকুমা ঠিক স্নেহের খাতিরে আমাকে নিয়ে যাননি। বাবার সামান্য টাকা ছিলো। আর আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সে টাকা পেলেন ঠাকুমা।'

এডেলট্রাউট থামলো। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে একটু হালকা হয়ে নিলো।

'তাও কাটছিলো কোনক্রমে। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে যেতে শুরু করলাম। মা মারা যাবার পরের দিনগুলোকে আর বড়ো একটা মনে পড়তো না।'

'গোল বাধালো ঠাকুমার দ্বিতীয় স্বামীকে নিয়ে। ঠাকুমার এ দ্বিতীয় স্বামী আমাকে সংযত করবার নাম করে এতো মারতো, মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। আমার তখন মনে হতো ওরা যখন আমায় দেখতে পারে না, যাবো না ওর চোখের সামনে। তাই সব সময় এড়িয়ে চলতাম। তবু সপ্তাহে তিন চার বার চলতো এই অত্যাচারের পালা।'

এডেলট্রাউটের চোখ জলে ভরে এলো। অনেকক্ষণ অদ্ভুত কেউ কথা বলিনি। সান্তনা দেবার চেষ্টায় আস্তে আস্তে এডেলট্রাউটের চুলের মধ্য দিয়ে আমার আঙ্গুল দিয়ে হাত বুলোবার চেষ্টা করছিলাম।

'অনেক, অনেক সহ্য করেছি। কোনদিন মুখ ফুটে কোন জিনিসের জন্য আব্দার করিনি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম। লোক দেখলে ভয় পেতাম। স্কুলের মেয়েরা লোভ দেখাতো কিন্তু ঠাকুমার কাছে কিছু চাইবার সাহস আমার ছিলো না।

এই করে বারো বছরে পা দিলাম। কেমন যেনো অদ্ভুত মনে হতো নিজেকে। জগতের রূপ রাগ গন্ধ আমাকে মদির করে দিতো। মনে হতো আমি নিজেকে ভালবাসতে শিখছি। আমার সমস্ত শরীরটা তখন আমার কাছে এক পরম বিস্ময়—বয়সের সঙ্গে দেহে ফুটে উঠলো যৌবনের ছাপ। কোত্থেকে মনে এলো লজ্জা সম্ভ্রম। অভিমান জেগে উঠলো আস্তে আস্তে। অত্যাচারকে ভয় পেতে আর ইচ্ছে করত না। অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে মনে হতো আর পারছি না। এবারে শেষ করতে হবে এর পালা। 'বহুবার এলবের জলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে কেঁদেছি। দু'একবার মনে হয়েছে নিজের জীবন রেখে দি এলবের জলে। কিছুই চিনি না। কিছুই জানি না। সে বয়েসে আর কি বা ভাববো? কিন্তু বার বার জলের ধারে গিয়ে ফিরে এসেছি। জলে নিজের ছায়া দেখে আমার ভীষণ মায়া হতো। তাই পারিনি। তখন আমার যৌবনের সুরু। ভালোবাসতে সুরু করেছি আমি নিজেকে।'

অন্ধকার থেকে মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে এডেলট্রাউট বললো, হয়তো একদিন তাই করবো। এলবেতেই শেষ হয়ে যাবো।

মাঝে মাঝে অনুভব করি এলবে আমায় টানছে। তখন আমি নিজেকে ভালোবাসতাম। এখন নিজেকে আমি ঘৃণা করি…।

এডেলট্রাউট আরো কি বলতে যাচ্ছিল। ওকে বাধা দিয়ে বললাম এডেলট্রাউট অবাস্তব কথা ভেবে মনকে দুর্বল করো না।

ওর হাত দুটো তুলে নিলাম আমার হাতে। অন্ততঃ এ সময়টার জন্য বোধ করুক ও একা নেই।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'অকসোনসোল হাসপাতালের তোমার ঘর দেখাবে না? দেখতে চাই তুমি কোথায় থাকো।'

'আমাদের কোয়ার্টারে কোন বয় ফ্রেণ্ডের যাওয়া বারণ। তোমায় যেতে হবে না। আমি এসে দেখা করবো তোমার সঙ্গে।'

'না ঠিক তার জন্য নয়। এমনি দেখতে গাইছিলাম তুমি থাকো কোথায়।'

ভালো লাগছিলো এডেলট্রাউটের কথা শুনতে। ওর ছোট বেলার কথাগুলো পাছে হারিয়ে যায় তাই খেই ধরাবার জন্য বললাম 'নার্স হলে কি করে সে কথা তো বললে না।'

এডেলট্রাউট আবার স্বুরু করলো। আরো একটা বছর কেটে গেলো। অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে তেরো বছর বয়েসে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। স্কুল থেকে আর বাড়ী ফিরিনি। সোজা হাঁটতে স্বুরু করলাম ঝিলের রাস্তা ধরে। রাত প্রায় দেড়টা অব্দি হেঁটেছিলাম। কোথাও থামিনি। আর পারছিলাম না। রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে পুলিশের গাড়ী এসে থামলো, অত রাতে নির্জন রাস্তায় একা একা বসে আছি দেখে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেলো। সব বললাম পুলিশের লোকদের। সব সত্যি কথা বললাম। কিন্তু ওরা আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলো আমার ঠাকুমার কাছে। লজ্জায় ক্ষোভে শুধু কেঁদেছিলাম পুরো দুটো দিন। ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লাম। কি করে জানবো ওটা শুধু আমার ব্যর্থতার স্বুরু।

অশান্তি কান্নাকাটি আর দুর্ভাবনা নিয়ে আরো ক'টা বছর কেটে গেলো। শেষ করলাম স্কুলের পাঠ, শেষ করার পর নার্স পড়ার কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কলেজে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে ছিলো। ঠাকুমারও খানিকটা উৎসাহ ছিলো। কিন্তু একটা ঘটনায় সব বদলে

গেলো। ঠিক করলাম এবার থেকে নিজের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিজেই নেবো।

এখন ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ি। সে সময়টায় ঠিক এমন ছিলাম না। মাঝে মাঝে কথাবার্তা শুনতাম না। ইচ্ছে করেই শুনতাম না। খানিকটা জেদ করে। শক্ত হবার চেষ্টা করতাম। রুখে দাঁড়াতে শিখলাম।

আমার বয়েস তখন সতেরো। ঠাকুমার দ্বিতীয় স্বামীর চোখ পড়লো আমার দেহের ওপর। অত্যাচার বন্ধ করে অন্যরূপে আমার সামনে এলেন একদিন।

সেদিনটা ছিলো রোববার। ঠাকুমা কার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। বাড়ীতে আমি একা। খানিকবাদে দরজায় শব্দ হতে দরজা খুলে দিলাম। ওপা ব্যাক্ ঢুকবেন বাড়ীতে। কথাবার্তা বেশী বলতাম না ওর সঙ্গে। ওপরে নিজের ঘরে বসে আছি। খানিকবাদে ওপা আমার ঘরে এসে হাজির। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। কাছে ডেকে আদর করলেন। তাতেই শেষ হলো না। আমার জামা খুলতে বলাতে আমার কেমন খারাপ লাগলো।

রুখে দাঁড়ালাম। বললাম না খুলবো না। দু পা সামনে এগিয়ে এসে হ্যাচকা টান মারলেন আমার ফ্রকটাতে। তত্ক্ষণে আমার সমস্ত সাহস জোগাড় করে চেঁচাতে সুরু করলাম। ওপা ব্যাক এক হাতে আমার মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে আমার জামাটা ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন। তখন মনে হচ্ছিল এর চেয়ে আমাকে মারলেও কিছু বলতাম না। আর সহ্য করতে পারিনি। জোরে একটা ধাক্কা দিলাম। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। আমি তার পেছনে তাকাই নি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলাম। সোজা উঠলাম ইয়োহানার বাড়ীতে।

আর কোনদিন ফিরে যাইনি ওদের কাছে।

ইয়োহানা আর আমি দুজনে মিলে ট্রেনিং নার্স হয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম।

জীবন সুরু হলো হাইডবার্গ হাসপাতালে।

অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছে এডেলট্রাউট্। বেঞ্চটার পেছনের রাস্তা দিয়ে গাড়ীগুলো এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে। ঠাণ্ডা হাওয়া আর গাড়ীর শব্দ। কথাগুলো যেন কুয়াশার সঙ্গে মিশে কোথায় হারিয়ে গেল।

বেদনা বোধ করছিলাম। একাত্মবোধ করছিলাম এডেলট্রাউটের সঙ্গে। আমার লম্বা নিঃশ্বাস পড়ার শব্দে এডেলট্রাউট আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার সন্ধ্যেটা নষ্ট করে দিলাম তো'!

কথা বলতে দিইনি এডেলট্রাউটকে। হাত দিয়ে আস্তে ওর ঠোঁটে চাপা দিয়ে বললাম 'এ সব কথা কেন বলছো'?

তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনে মনে হলো 'আমার দুঃখভরা জীবনকে তুমি সহানুভূতি জানাচ্ছো। আমার জীবনের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়ে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাই না'।

এডেলট্রাউট যেন কিছুটা বদলে গেলো। আমার থুঁতনিটা ওর মুখের দিকে তুলে ধরে বললো 'জানো ডিপি ছোটবেলার সেই দিনগুলোর দুঃখ কষ্ট আজ আমার কাছে সামান্যই মনে হয়। এর পরের দিনগুলো নিয়ে এসেছে আরো জ্বালা। আরো দহন। জ্বালা যখন শরীরের ওপর দিয়ে যেতো খানিকটা বাদে ভুলে যেতাম। কিন্তু যখন চাবুক পড়লো মনে ভোলার আর কোন পথ খুঁজে পেলাম না। ওর ভাব বদলে গেলো। না! তোমাকে আর আমার কথা কিছু বলবো না।

এডেলট্রাউট মাঝে মাঝে কেমন আনমনা হয়ে যায়। একটা ছেলেমানুষী ভাব।

জোর করবার চেষ্টা করিনি। একবারও বলিনি 'তোমার পরের কাহিনী বলো'।

আবার যখন ওর মন গুমোট ব্যথায় জমে উঠবে হয়তো আবার অমনি কোন সন্ধ্যায় এডেলট্রাউট বলে যাবে ওর কথা।

এডেলট্রাউট যে হাসপাতালটায় কাজ করে সেটা বাইরে

থেকে দেখে আমরা যখন ল্যাঙ্গেনহর্নে পৌঁছুলাম তখন রাত প্রায় দুটো। রাস্তা ভুল করি সন্দেহ করে এডেলট্রাউট পৌঁছতে এসেছে আমাকে।

দ্বিধার বাধা কাটিয়ে বলেছিলাম 'আজ এ ঠাণ্ডায় সাইকেল চালিয়ে আর কোয়ার্টারে ফিরে যেয়ো না। আমাদের গেস্ট রুমটায় থেকে যাও'।

কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললো 'আজ নয়। আমার জীবনের সব কথা যে দিন তোমার শোনা হবে তারপর। তারপর তুমি যা বলবে আমি করবো'।

এডেলট্রাউটের কথায় সেই দৃঢ়তা। কথার জবাব দিই নি। ঘাড় কাত করে জানালাম যা তোমার ইচ্ছে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'কই বললে না তো কবে আসবে আবার'?

'তুমি তো বলোনি, আবার আসতে'। ও হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে।

'তোমার যখুনি ছুটি হবে চলে এসো। আমাদের এখানে তোমার জন্য আসার কোন সময় দেখতে হলে না তোমাকে।'

ঠিক আছে। সামনের বৃহস্পতিবার আসবো।

তাকিয়েছিলাম এডেলট্রাউটের চলে যাওয়ার দিকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিক একেবারে নিঝুম।

সাইকেলটা ঘোরাবার আগে এডেলট্রাউট ফিরে এলো। হঠাৎ ওকে ফিরতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম।

'তোমায় একটা কথা বলতে এলাম।' ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে আছি ওর মুখের দিকে চেয়ে। 'এ শিবিরে রোজ রোজ আসা এটা ভালো দেখায় না।'

কথা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এডেলট্রাউট বাধা দিয়ে বললো, 'তার চেয়ে বলো বৃহস্পতিবারে আমরা বাইরে অন্য কোথাও যাবো।

সেদিন তুমি আমার অতিথি। ঠিক চারটেয় কিভিট্সমুরে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।'

কি জবাব দেবো ভাবছিলাম। এডেলট্রাউটই প্রশ্ন করলো, 'বুঝলে তো'?

মাথা নেড়ে জানালাম ঠিক আছে।

কিভিট্সমুরে আমার পৌঁছানোর খানিকটা আগেই এসে অপেক্ষা করছিল এডেলট্রাউট। কিভিট্‌সমুর শহরের বাইরের অংশটার সঙ্গে খোদ শহরের যোগাযোগ।

হ্যামবুর্গের লোকেরা বলে 'দ্যায়ার ইজ অলওয়েজ সামথিং গোয়িং অন ইন হ্যামবুর্গ।' সে ঠাণ্ডার মরশুম হোক আর বসন্তের মরশুম হোক। একটা কিছু লেগে আছেই। কোন টুরিস্টকে এসে একেবারে ফাঁকা ঘুরে যেতে হবে না।

কিভিট্‌সমুর থেকে আমরা দুজনে মাটির নিচের রেলে চড়ে চলে এলাম শহরের কেন্দ্রে, রাথহাউসে।

এডেলট্রাউট আমাকে দেখলো আর্ট গ্যালারী। শহরের প্রধান আর্ট গ্যালারী ছাড়াও এখানকার ব্যাঙ্ক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এমনকি বড়ো বড়ো সওদাগরী সংস্থাগুলো নতুন নতুন ছেলে ছোকরা শিল্পীদের প্রথম এক্সিকিননের জন্য তাদের দপ্তরের ঘর ছেড়ে দেন। বিনে পয়সায় দেওয়া হয় সে সব ঘর। প্রতিদিনের খবরের কাগজে খোঁজ-খবর পাওয়া যায় কোথায় কবে কার প্রদর্শনী হচ্ছে। তরুণ প্রতিভা বিকাশের সুন্দর সুযোগ। তরুণ-তরুণীদের নতুন ছবি অনেক প্রবীণদের ছবিকে হার মানিয়ে দিয়েছে।

একটার পর একটা ছবি দেখে চলেছিলাম। খেয়াল হলো এডেলট্রাউটের ধাক্কা খেয়ে। 'সন্ধ্যে হয়ে এলো এবারে বন্ধ হয়ে যাবে গ্যালারী। বাইরে চলো।'

সন্ধ্যের অন্ধকারে আমরা এগোচ্ছিলাম মাটির নিচের রেলের দিকে। এডেলট্রাউটকে চুপ করে থাকতে দিতে ভালো লাগছিল না।

বললাম, 'হ্যামবুর্গের রিপারবনের কথা 'খুব শুনতাম। একবার দেখাবে আমাকে'?

এডেলট্রাউট মৃদু হেসে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো।

রেষ্টুরেন্টে আমাদের টেবিল বুক করা আছে রাত আটটায়। তারপর দেখা যাবে। কথাটা খুলেই বললাম, 'ঠিক ভেতরে ঢুকে অতোটা সময় কাটাবার মতো সময় আমার নেই। বলো বাইরে থেকে ঘুরে শুধু জায়গাটা একবার দেখতে চাই।'

অনেকগুলো রাস্তা পেরিয়ে আমরা এলাম সেই পালৌতে! হ্যামবুর্গের বিখ্যাত নৈশ-প্রমোদশালাগুলো সুরু হয়েছে এখান থেকে। রাস্তার দুধারে বহু নৈশ ক্লাব। ক্লাবগুলোর বাইরে থেকে ছবি দেখে ভেতরে কি হচ্ছে খানিকটা আঁচ করা যায়। কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে নানা রং বেরঙের নগ্ন মেয়েদের ছবি। কোনটা আবার এমনভাবে কাপড় জড়ানো হয়েছে যাতে নারী দেহকে আরো লোভনীয় দেখায়।

সদ্য নোঙর করা জাহাজের নাবিক থেকে টুরিস্ট সবার আনাগোনা এখানে। যার যার রুচিমতো ক্লাব বেছে নিতে হবে। সব পছন্দ মতো প্রমোদ বিতরণের ব্যবস্থা। শহরের লোকেরাও আসেন। তবে সংখ্যায় কম। পঞ্চাশ উর্ধ্বে দু'চার পাঁচ জনকে অবশ্যই পাওয়া যাবে রোজই কোন না কোন ক্লাবে।

একই ধরনের ছবি। মানুষের মুখে সেই এক ভাব। বেশীক্ষণ দেখতে ভালো লাগছিলো না।

রিপারবান থেকে আমরা গেলাম স্টিফেন্স পালেসের কাছে একটা রেষ্টুরেন্টে।

মোমের অল্প আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল এডেলট্রাউটকে। ওকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। এডেলট্রাউটকে জানতে ইচ্ছে করছে। ওর চোখের হাঁসির বেদনাকে ছাপিয়ে বেরিয়ে এলে বড়ো অদ্ভুত লাগে ওকে দেখতে।

অনেকক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাষার রূপ নিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না।

খাওয়া-দাওয়ার পর পয়সা দেবার বেলা সামান্য আপত্তি জানলাম।

সোজা জবাব 'আমি চাকরি করি। তুমি চাকরি করো না'। এক ফেনিংসও তুমি খরচা করবে না। আর এটা বিদেশ। তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

সুতরাং পয়সা দেবার অধিকার আমার নেই।

ধন্যবাদ জানালে ও মনে করে ফরমালিটি করছি। তাই চুপ করে রইলাম।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটছিলাম আমরা। রাত বেশী হয় নি। এডেলট্রাউটের ইচ্ছে ছিলো না তাড়াতাড়ি ফেরবার।

জিজ্ঞাসা করলো 'ঐ বড়ো লোকটার ধারে বসলে কেমন হয়'!

আজকে ঠাণ্ডা অন্য দিনের চেয়ে কম। দু'চারজন এদিক-ওদিক পায়চারী করছে। দোকানপাটগুলো আলো বন্ধ করে দিয়েছে। বেশ অন্ধকার হয়ে আছে।

সেদিন রাত থেকে ওর সম্পর্কে আগ্রহ আরো বেড়ে গিয়েছে। বার বার মনের ভেতর তোলপাড় করছে 'কই সোজা করে জবাব পেলাম না তো!' এডেলট্রাউট একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। মোটর গাড়ীর আলোগুলো মাঝে মাঝে ঠিকরে উঠছে জলে পড়ে। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওর চোখ দুটো। কেমন যেনো একটু ঝাপসা।

একা চুপ চাপ বসে থাকলে আপনা থেকেই ফুটে ওঠে বেদনার ছাপ। খানিকবাদে আমি আর চুপ করে থাকতে পারছিলাম না।

'কি ব্যাপার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' 'কেন তোমার ঘুম পেয়েছে?' পাল্টা প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলাম না।

'না। আমার ঘুম পায়নি।' তোমার কোন সাড়া শব্দ নেই। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

কিছুতেই ওকে স্বাভাবিক করতে না পেরে একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হলো।

'তোমার কোন বয় ফ্রেণ্ড নেই' ? এডেলট্রাউট মুখ তুলে সোজা ওর চোখ দুটো রাখলো আমার চোখের ওপর।

'কেন তুমি আমার বয় ফ্রেণ্ড নও?' বললাম 'না ঠিক সেভাবে বলিনি। জানতে চাইছিলাম…'।

'তুমি সত্যি জানতে চাও আমার সম্বন্ধে?' কথার সঙ্গে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ওর গলার স্বরকে ভারী করে তুললো।

'তোমাকে বুঝতে চাই। তোমাকে জানতে চাই। ইয়োহানার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমার সমস্ত কৌতূহল জড়িয়ে রয়েছ তুমি। ভয় পাই। তোমাকে সোজাসুজি সব কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। তুমি যদি আঘাত পাও। তাই জোর করার চেষ্টা করিনি। তোমার মন আবার যখন আপনা থেকে কথা বলবে তখনই শুনবো আমি তোমার কথা'।

'আমার সব কিছু শুনলে হয়তো হতাশ হবে তুমি'।

এডেলট্রাউটের গলার সেই ভারী আওয়াজটা আরো গভীর হয়ে এসেছে।

খানিকটা থেমে এডেলট্রাউট আবার শুরু করলো 'বিশ্বাস করো ডি পি ভালোবাসা কি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি। অনুভব করতে চেয়েছি। প্রেম-ভালোবাসা স্নেহ-মমতা-দয়া কাকে বলে আজো আমার জীবন দিয়ে বুঝতে পারলাম না।

'আমিও স্বপ্ন দেখতাম। কতবার স্বপ্ন দেখেছি। কতবার শুনেছি 'তোমায় ভালোবাসি'। ও কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণে বল পেতাম। নতুন করে দেখতাম পৃথিবীটাকে। ভুলে যেতাম আমার শৈশবকে।

ঝর ঝর করে কান্নায় ভেঙে পড়লো এডেলট্রাউট। এডেলট্রাউটের গলার স্বর জড়িয়ে আসছে।

ভালোবাসার নামে এত প্রতারিত হয়েছি তাই আজ ঐ কথাটা আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে।

ভালোবাসা কথাটা এতো সহজ হয়ে গেছে, সবাই বলে চলেছে। প্রথম প্রথম আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। নিজে আমিও ভালোবাসি। আবার ক'দিন পরে সব মিথ্যে হয়ে গেছে। সবই ফাঁকি।

আমি বোঝবার চেষ্টা করলাম 'ওরকম অনেকের জীবনেই হয় এডেলট্রাউট। তারজন্য এতো ভেঙ্গে পড়ো না।'

'সত্যিকারে এতোটুকুও পেলে আমিও মাথা ঘামাতাম না, ডিপি। আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা একে একে আমার সব কিছু নিঙ্‌ড়ে নিয়ে গেছে। আজ আমি রিক্ত। আজ আমি শূন্য। এডেলট্রাউট রুমালে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলো।

সেদিন রাতে তুমি যখন প্রশ্ন করলে আমি তোমায় জবাব দিতে পারিনি। তারপর পুরো সপ্তাহ ধরে আমি ভেবেছি। ভয় হয় আমার। কথাটা বলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের ভেতরে কেমন যেন একটা সংসার শিহরণ বয়ে যায়। যদি মিথ্যে হয়ে যায়!

এডেলট্রাউট থেমে গেল। রুদ্ধ কান্না চাপবার চেষ্টা করে এডেলট্রাউট আমাকে আরো কাছে টেনে নিলো। একেবারে ওর বুকের কাছে। তু'হাতে জড়িয়ে ওর দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায় আমাকে।

এডেলট্রাউটের অনেক কাছে আমি। তবু বহু দূরে। ওকে তবু ছুঁতে পারছি না।

আমি কিছু বলার আগে ও তু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে এঁকে দিলো প্রথম চুম্বন। রোমাঞ্চ লাগছিলো এডেলট্রাউটের চুম্বন। ছোট্ট ছেলের মতো ওর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করলাম। আমার সারা শরীরে তখন শিহরণ।

এডেলট্রাউট কথা বললো। 'তোমাকে আমার সবকিছু বলতে

চাই। সব শুনে আমায় যদি ঘৃণা করো, তবু সেটাই আমার পাওনা বলে মেনে নেব। আমি তোমার কাছে ছোট হয়ে গেলে ক্ষতি নেই। হঠাৎ আকুতিতে ভেঙে পড়লো এডেলট্রাউট। 'আমায় ভুল বুঝোনা ডিপি।' এডেলট্রাউট চোখ মুছে খানিকটা সহজ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো।

হঠাৎ দুষ্টুমি খেলে গেলো ওর মাথায়। অভিমানের ভাণ করে এডেলট্রাউট বললো, 'কই সেদিন রাত্তিরে আমাকে বিদায় দেবার বেলা একবারও চুমু খেতে চাইলে না তো'!

'তুমি যে আমার আদর গ্রহণ করবে তা না জেনে আগে থেকে তোমায় চুমু খাওয়া কি ঠিক হতো?'

'তুমি বড্ডো ইমপ্র্যাকটিক্যাল।'

'তুমি প্র্যাকটিক্যাল হয়ে আনন্দ পেয়েছ কি?' কথাটা এডেলট্রাউটের অন্তরে আঘাত করবে বুঝতে পারি নি।

ও চুপ করে বসে রইলো। বুঝলাম নিজের মনের গভীরে আবার ডুব দেবার চেষ্টা করছে এডেলট্রাউট।

খানিকবাদে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওকে দিলাম। 'কই, তোমার কথা শোনার জন্য আমি বসে আছি যে।'

এডেলট্রাউট একটু হাসলো। ফিরে গেলো আবার সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে।

হাইডবার্গ হাসপাতালে শুরু হলো আমার কাজের জীবন। মনে হলো ক্রমে ক্রমে জীবনটা বদলে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে যা পাইনি পড়ে রইল তা অবচেতন মনে। সামনে যা তাই তখন আমার কাছে সবচেয়ে বড়। পরিবর্তনকে মেনে নিলাম সমস্ত কিছু দিয়ে।

কাজের মধ্যে সারাটা দিন কাটাতে দারুণ ভালো লাগতো। নিজেকে কখনো টায়ার্ড মনে হতো না। প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেতাম হাসপাতালের সব আধুনিক যন্ত্রপাতি আর ব্যবস্থা দেখে। বাড়ীর বাইরের অভিজ্ঞতা আমার একদম ছিলনা। প্রাণ দিয়ে

সেবা করতাম প্রতিটি রোগীকে। ওরাই আমার সব কিছু। মানুষের জীবনের মূল্যকে বুঝতে শিখলাম। ভালোবাসতে শিখলাম মানুষকে। অপারেশন টেবিলে কাউকে দেখলে সে ব্যথা আমার বোধ হতো। খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে বসে থাকতাম তার বেডের পাশে। মনটা ছিলো ক্ষুধার্ত। এর আগে কোনদিন এত করে বোধ করিনি অন্যের ব্যথা।

কাজের বাইরে একমাত্র সঙ্গী ছিল ইয়োহানা। আমার সব কিছু। নিজেরাও বুঝতে পারতাম না কখন আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এতো গাঢ় হয়ে উঠেছিলো। আমাদের মনের কথা কেউ কাউকে না বলে থাকতে পারতাম না। একে অন্যের ছায়ার মতো রইলাম।

ইয়োহানাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। আমরা থাকতাম নার্সেস কোয়ার্টারের একই ঘরে। ইয়োহানা মাঝে মাঝে বাড়ী যেতো। একদিন ওর সাথে দেখা না হলে সে দিনটা আমি কেঁদে কাটাতাম।

বাধা দিয়ে বললাম এখন কিন্তু ইয়োহানা তোমায় না দেখলে ছটপট করে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে সহজ করে নিলো এডেলট্রাউট।

তখন ইয়োহানাকে সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসতে সুরু করেছি। আমার উনিশ বছরের জীবনে ইয়োহানার কাছ থেকে প্রথম পেলাম স্নেহ ভালোবাসা মমতা অনেক কিছু। আমার জন্মদিনে একটাই উপহার পেতাম। সেটা দিতো ইয়োহানা। ক্রীষ্টমাসে একটাই উপহার। সেটাও দিতো ইয়োহানা।

গভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে এডেলট্রাউট একটু হাসলো। বেশ কিছুদিন পরে মনে হলো ইয়োহানার কাছে সবকিছু পেয়েও আমার হৃদয় পূর্ণ হতে চাইছে না। বুঝতে পারলাম যৌবনে পা দিয়েছি। নিজের দিকে এর আগে আর কখনও তাকানোর প্রয়োজন হয় নি। সুযোগও পাইনি।

তখন উনিশের কোঠা ছাড়িয়ে কুড়িতে পড়েছি! শরীরের ভেতর থেকে একটা অব্যক্ত অনুভূতি নাড়া দিলো আমাকে।

ছোটবেলা শুধু বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে থেকে পুরুষ দেখে ভয় পেতাম। লজ্জা হতো বেশীক্ষণ কথা বলতে। পুরুষ রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে এডেলট্রাউট আবার সুরু করলো।

হঠাৎ বদলে গেলো সব কিছু। ইতিমধ্যে নার্সিং-এর একটা পরীক্ষায় পাশ করে গেছি। পূর্ণ উদ্যমে কাজ চলেছে। সিনিয়ার নার্স না এলে আমাকে দেওয়া হতো ডিপার্টমেণ্টের চার্জ। এমনি একদিনে প্রথম হারালাম নিজেকে। এপ্রিল মাসের বিকেল বেলা।

সে সপ্তাহে আমার ডিউটি ছিলো সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। রোগীদের ড্রেসিং হয়ে গেছে হাতে কাজ বড়ো একটা ছিলো না। বাইরে গরম পড়তে সুরু করেছে। হাসপাতালের চারদিকে টিউলিপ আর পপির মেলা। সবাই বেরিয়েছি স্প্রীং এনজয় করতে।

এমনি সময় নতুন পেসেণ্ট এলো। অজ্ঞান অবস্থায় ডিপার্টমেণ্টে নিয়ে এলো পেডারজিলকে।

নামটা বলে এডেলট্রাউট একটু দম নেবার জন্য থামলো।

'দেখে মনে হলো বছর পঁচিশেক বয়েস হবে। ভারী সুন্দর ওর চেহারাটা। ক্যাজুলটি থেকে খবর নিয়ে জানলাম মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল। এমন সময় লরী এসে ধাক্কা দিয়েছে পেছন থেকে। একটা পা ভেঙ্গে চুরে একশার হয়ে গেছে। আর কোথাও চোট ততো খারাপ নয়।

ভীষণ মায়া হলো ওর অজ্ঞান মুখটার দিকে তাকিয়ে। রাত্তিরে ডিউটি অফ্ হবার পর ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করেছিলাম। ডিপার্টমেণ্টের সিস্টারের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাচ্ছিলাম। সেদিন ওর জ্ঞান ফিরলো না।

পরের দিন থেকে বিশেষ করে সেবা আর যত্ন করতে লাগলাম পেডারজিলকে। ওর যেদিন জ্ঞান ফিরলো আমি ছিলাম ওর পাশে। চোখ মেলে ও প্রথম তাকাল আমার দিকে। অসহায় ওর দৃষ্টি। ওর অসহায় চাউনি দেখে আমার মনে যেটুকু দ্বিধা ছিলো সেটুকুও মুহূর্তে সরে গেলো। কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম 'এখন কেমন আছো' ?

ও শুধু নির্বাকদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

এডেলট্রাউট হেসে বলেছিলো 'এখন নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হয়'।

'হঠাৎ এ কথা বলছো কেন ?'

'তারপর থেকে পেডারজিলের যে কোন প্রয়োজনে অযাচিত-ভাবে ওকে সেবা করে গেছি।'

রাত নেই দিন নেই। ডিউটি আছে কি নেই কিছু পরোয়া করিনি। কোয়ার্টারে বসে ওর জ্ঞান হবার পরের মুখটার কথা মনে পড়লেই চলে আসতাম হাসপাতালে। নানা অছিলা করে ঘুরে যেতাম পেডারজিলের কাছে।

ফিরে এলো ওর জ্ঞান। সব বুদ্ধি। আস্তে আস্তে কথা বলতে সুরু করলো পেডারজিল।

ও যেদিন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটলো আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিলো। আমি নিয়ে গেলাম ওকে ফিজিওথেরাপিতে। পেডারজিল স্বাভাবিক হয়ে আসছে, সে যে কি আনন্দ তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

মাঝে মাঝে শাসন করতাম। ও মেনে নিতো।

মনে মনে বুঝতাম আমি অনেকদূর চলে এসেছি। তবু নিজেকে হারাতেই ভালো লাগতো তখন।

ইশারায় পেডারজিলের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়া নিয়ে অন্যেরা

হাসি ঠাট্টা করতে সুরু করেছে। মাঝে মাঝে বেশ অস্বস্তিবোধ হতো। তবু ভালো লাগতো।

মনে হ'তো সব কিছু করতে পারি। ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। ওর বেডের চারদিকে পর্দা টেনে বহুবার ওকে চুমু খেয়েছি। কোন কিছুতে ভয় ছিলো না।

এখন বুঝতে পারি কেন আমার এ নেশা লেগেছিলো।

এডেলট্রাউট কথাগুলো বলে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে থেমে গেলো।

অনেকক্ষণ ওর মুখে কথা নেই। আমি কি বলবো ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। একটু বোকার মতোই প্রশ্ন করলাম কেন করেছিলে…?

এডেলট্রাউট বোধহয় তৈরী ছিলো জবাবের জন্য। শুধু আমি নয়, জানো ডিপি, জার্মানীর উনিশ-বিশ বছরের একটি মেয়ে প্রেমে পড়লে সে সব কিছু করতে পারে। একটি ছেলের অন্তরঙ্গতার জন্ম তার মনের সব বাঁধন টুটে যায়। আমরা বলি উনিশ বছরে উত্তর সাগর থেকে এলবেতে জোয়ার আসে। সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ওই বয়েসের জোয়ারে কোন কিছুর বাধা মানে না। সামনে যা পায় দুর্মদ গতিতে তা ভেঙ্গে চুরে ছুটে চলে।

তখন আমারও এসেছিলো অদ্ভুত মাদকতা—নেশায় বিভোর হয়ে উঠেছিলাম। এগিয়ে যেতাম সবার আগে। সব জায়গায়।

হঠাৎ যেন নতুন করে দেখতে শিখলাম পৃথিবীটাকে। নতুন পরিচয় আরেকটা জগতের সঙ্গে।

অনুভব করলাম মা বাবা আর পরিবার পরিজনের চৌকাঠ পেরিয়ে পুরুষ বেছে নেবার পালা এসেছে জীবনে।

সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পেতাম নতুন কিছু। সব কিছুকে মনে হতো স্বাভাবিক।

সব রকম আদিমতা নাচন লাগাতো আমার শিরায় শিরায়।

বয় ফ্রেণ্ডের কথা তখন বাইবেলের চেয়েও মূল্যবান মনে হতো।

পেডারজিলের সঙ্গে, ওর আলিঙ্গন আর স্পর্শ পাবার জন্য আমার সমস্ত অনুভূতি তখন আকুল হয়ে থাকতো।

আজ তোমাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না, আমার সে জীবনের কথা।

যে অনুভূতি নিয়ে অপেক্ষা করতাম প্রতিটি স্পর্শের জন্য আজ আর তা কথার রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে না। ভেবে ভালো লাগতো, আমার জীবনের প্রথম বয় ফ্রেণ্ড পেডারজিল।

এডেলট্রাউট থেমে গেলো। আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম না। এডেলট্রাউট আবার কাঁদছে। অতোটা উচ্ছ্বাসে সব কিছু বলে গিয়ে নিজের কথাগুলোকে ও নিজে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ওর কথার শব্দে অনুভূতি জ্ঞান পেয়ে ওকে করে তুলেছে আবেগ

বাধা দিলাম না ওকে। কেঁদে হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে ওর মন। বহুক্ষণ তু'জনে কোন কথা বলিনি। এডেলট্রাউট শান্ত হলো।

'পেডারজিল সইলো না বেশীদিন ভাগ্যে।'

আভাসে বুঝতে পারলাম ওর প্রথম প্রেমের পরিণতি সুখকর হয় নি। খুব সহজ হয়ে কথাগুলো উঠলো। এটা ঠিক ভাবতে পারিনি আমি।

ওর মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার রেখাগুলো নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠেছে। অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম 'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আর কোন খোঁজখবর করেনি তোমার' ?

এডেলট্রাউট গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো 'তা হলে মনকে বোঝাতে পারতাম পেডারজিল আমাকে চায় নি। ও আমাকে ঘৃণা করেছে। কিন্তু তা হয় নি। আমিই ঘৃণা করেছিলাম পেডারজিলকে'।

খানিকটা চুপ করে বসেছিলাম। হয়তো এডেলট্রাউট সামলে

নিয়ে আবার শুরু করবে। ওকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে আমারই উৎসুক্য জেগে উঠছিলো বেশী।

ও বাধা দিলো। সে অনেক খারাপ কথা। 'তোমার শুনে কাজ নেই।'

খারাপ্ কথা বলাতে আরো জেদ চেপে গেলো।

'তোমার সব কথা আমাকে শোনাবে বলেছো। তুমি না বললে আমার অবশ্য জোর করার কিছু নেই।'

আমার কথার সুরে অভিমানটা এডেলট্রাউটের কানে লেগেছিল।

'ডিপি, আমার কোন দ্বিধা নেই। আমার হারাবারও কিছু নেই। পাবারও কিছু নেই। আমি সব বলতে পারি তোমাকে। সব শুনলে আমায় কাছে টানতে তোমার দ্বিধা হয় তাই ...।'

কথায় বাধা দিলাম। 'এডেলট্রাউট সত্য লুকিয়ে কোন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। সত্যকে জানতে ভয় পাবো কেন বলো!'

এডেলট্রাউট তাকিয়েছিল আমার চোখের দিকে। ওর জড়তা নেই। এডেলট্রাউট স্বচ্ছ স্বাবলীল। আবার শুরু করলো এডেলট্রাউট। 'আস্তে আস্ত পেডারজিল সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠলো। সবাইকে বিদায় জামিয়ে ও চলে গেলো হাসপাতাল ছেড়ে। যেদিন চলে গেলো মনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। কৃতজ্ঞতা জানালো কিন্তু একবারও ওর ঠিকানা দিলো না। অভিমানে আমিও চাইনি।'

ক'দিন পরে ক্যাজুয়েলটিতে এসেছিলো পা দেখাতে। ছুটে গিয়েছিলাম ওকে দেখতে। পেডারজিল জানালো ও আবার কাজকর্ম শুরু করেছে।

সেদিন দেখা হয়েছিলো অল্পক্ষণের জন্য। সারা সন্ধ্যে ওর কথা ভেবে কাটিয়েছিলাম। মনটা হাল্কা করবার জন্য ইয়োহানাকে জানালাম সব কিছু।

দিন চারেক পরে ফিরে এলো পেডারজিল। এবারে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিসের টানে ও এলো জানিনা। তবে

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এটাই আমার সব চাইতে ভালো লাগছিলো।

আমি তখন আমার কোয়ার্টারে। ওর হাতে একরাশ ডায়ানহাস। পেডারজিল জানতো সব চাইতে বেশী ভালোবাসি ঐ ফুলগুলোকে। সোজা নিয়ে এলাম আমার কোয়ার্টারে। আমার ঘরে।

সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ওকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে জানালাম আমার কৃতজ্ঞতা।

এর পর প্রায়ই আসতো আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমরা মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেতাম অকসেনসোলের ঐ রাস্তা ধরে।

দিনে দিনে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নীবিড় হয়ে উঠলো। পেডারজিলকে ছাড়া তখন কিছু ভাবতেই পারতাম না।

রাত বেশী হয়ে গেলে ও থেকে যেতো আমার কাছে। ইয়োহানা অন্য কারো ঘরে শুতে চলে যেতো।

এতো কাছে পেয়েও মন ভরতো না। অপেক্ষা করতাম ও আবার কবে আসবে তারজন্য।

শুধু ওর কথা ভাবতে আর ভালো লাগতো না। ওকে চাইতাম আমার দেহের প্রতিটি রোমকুপ দিয়ে। অনেক অনেক রাত আমরা কাটিয়ে দিয়েছি এ ভাবে।

জীবনটাকে তখন ভীষণ পূর্ণ মনে হোত। স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। ছোট বেলার কোন স্মৃতি আর আমাকে ব্যথিত করতো না। পেডারজিল আমাকে প্রপোজ করেনি। আমিও ওকে জিজ্ঞেস করিনি। পেডারজিল আমার জীবনে এসেছে এটাই আমার আনন্দ।

এ কথাগুলো বলে এডেলট্রাউট আগের চেয়ে আরো স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো। খানিকটা যেন জোর করেই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে।

সে দিনগুলোতে আমার একবারও মনে হয় নি পেডারজিলকে

আমি কোনদিন ঘৃণা করবো। ওকে ভালো না বেসে তখন আমার বাঁচার উপায় ছিলো না।

হঠাৎ কেমন যেন সব বদলে গেল। একটা শুধু বিকেল। সব কোথায় হারিয়ে গেলো।

সেদিন রোববার। পেডারজিলের আসার কথা ছিলো সন্ধ্যে-বেলা। বিকেলের দিকে একজন পুলিশ অফিসার এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পেডারজিলকে চিনি কিনা প্রশ্ন করতে আমার মনে হলো ও বোধহয় আবার একসিডেণ্ট করেছে।

পুলিশ অফিসার জানালেন সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম পেডারজিল পুলিশে ধরা পড়েছে। কেন ধরা পড়েছিলো জানো?

হঠাৎ প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলাম না। বললাম 'না ঠিক অনুমান করতে পারছি না'।

এডেলট্রাউট আমার জবাবে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলো। বললে 'আমিও কোনদিন চিন্তা করতে পারিনি'। একটি নাবালক ছেলের সঙ্গে যৌন সংসর্গের অপরাধে পেডারজিল পুলিশে ধরা পড়েছে।'

এর আগে এতো অপমানিত আর কখনো বোধ করিনি। যখন প্রথমে শুনলাম মনে হলো কান দুটোয় গরম লোহা ঢুকে এলো। খানিকক্ষণ কিছু শুনতে পাইনি।

আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। তার কাছে আমার নারীত্বের অপমান। সেদিন কোন কিছু ভাববার মতো মানসিক বল ছিলো না আমার।

পরে আরো প্রকাশ পেলো। অনেক মেয়ের সঙ্গে ও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত ছিলো।

বহু যুক্তি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি। এতে সত্ত্বেও নাবালক ছেলেটির সঙ্গে ওর যৌন সংসর্গের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারিনি।

পরে পুলিশের লোকেরা বলেছিলেন যৌন বিকৃতির দোষে ওকে দশ বছরের জন্য কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে।

কান্নায় সাগর বইয়ে দিয়েছিলাম ইয়োহানার কাছে গিয়ে। পেডারজিল আমাকে যে আঘাত করেছে এতো বড় আঘাত আর কেউ করতে পারেনি। সব চাইতে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম আমার প্রথম যৌবনের প্রথম পুরুষের কাছ থেকে।

মনে মনে বহুবার ওকে ক্ষমা করার চেষ্টা করেছি। ও অভিনয় করেছে আমার সঙ্গে। তবুও অভিনয় করেছিল প্রেমের। অভিনয় করেছিল ভালোবাসার। আমার জীবনে প্রথম পুরুষের স্পর্শ।

সব কিছু হারিয়ে আমার শূণ্য মন আবার রিক্ত হয়ে গেলো। সামনে রইলো আমার বেদনার জগৎ। আমার একার জগৎ।

এডেলট্রাউট থেমে গেছে।

রাত ক'টা বাজে দেখার মতো মনের অবস্থা আমার ছিলো না। এডেলট্রাউটের সমব্যথী হতে চাইছিলাম। মিশে যেতে চাইছিলাম একাত্ম হয়ে।

জলের দিকে আমরা দু'জনেই তাকিয়ে আছি। বেদনার গভীরতা খুঁজতে গিয়ে দু'জনেই ডুবেছি।

সান্ত্বনা দিতে গেলে পাছে ও আঘাত পায়। সান্ত্বনা দেবার কথা ভাবিনি।

কালের সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেই খুঁজে পেয়েছে দুঃখকে জয় করবার বল! দুঃখকে জয় করেছে তবে জীবনের প্রথম পুরুষ পেডারজিলের স্মৃতি এডেলট্রাউটের মনে এখনো জাগিয়ে তোলে পুরোনো ব্যথা।

সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম 'আর এখানে বসে থাকলে মাথায় হিম লাগবে। চলো এবারে ওঠা যাক'।

এডেলট্রাউট হেসে বললো, সব কিছু শুনতে চাইছিলে? এতো শুধু তার শুরু।

ওকে দেখে আমার বিস্ময় লাগছিলো। এডেলট্রাউট আজ একেবারে স্বভাবিক হয়ে গেছে।

প্রথম দিনের সেই সন্ত্রস্ততা কোথায় লুকিয়েছে। ওর ভেতরের গ্রন্থীতে টান পড়েছে।

ও আজ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

জীবনের সব কিছু গুছিয়ে প্রকাশ করার মধ্যে আত্মতুষ্টি খুঁজছে। বাইরের জগৎ যা দিতে পারে নি অন্তরে খুঁজছে তার সাড়া।

জমাট কুয়াশায় ঠাণ্ডা লাগছিলো। তবু এ মুহূর্তটা নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়, এডেলট্রাউট বলতে চায়। এ রাতটা চলে গেলে হয়তো পড়ে থাকবে অনেক কিছু অজানা।

উঠে পড়লাম লেকের পার থেকে। একটা ট্যাক্সী ধরে আমরা চলে এলাম আমাদের শিবিরে।

অনুরোধ জানিয়ে বললাম 'আজ তোমাকে ছাড়ছি না। থেকে যাও গেস্টরুমে আজকের রাতটা।

সবাই মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে ততোক্ষণে। না এরহার্ড আর গুড্রুন এখনো জেগে রয়েছে। গুড্রুনের ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। আজ রাতটা এরহার্ড হয়তো ওখানেই কাটাবে।

এডেলট্রাউট আর আমি লাউঞ্জে এসে বসলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এডেলট্রাউট কথা বললো 'কাল তুমি কাজে যাবে না?'

'হ্যাঁ যাবো। তবে আজ তোমার কথা শুনবো। তোমার সঙ্গে কথা বলার মেজাজটা নষ্ট করে দিতে চাইনি। এক রাত না ঘুমুলে কিছু যাবে আসবে না।'

'আমার কাল অফ ডিউটি, সকালে বাড়ী গিয়ে আমি ঘুমুতে পারবো, তোমারই কষ্ট হবে!'

'অন্যদিন তোমারে কথা রাখবো। এডেলট্রাউট, প্লিজ আজ তুমি আমার কথা শোনো।'

আমার আগ্রহ তখন চরমে পৌঁছেছে। ওর জীবনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে কোনো পরিচিত হবার একটা বিরাট আগ্রহ বোধ করছিলাম।

পৃথিবীর সব মেয়েই যৌবনের শুরুতে স্বপ্ন দেখে। এডেলট্রাউটও স্বপ্ন দেখেছিলো। আজ সে স্বপ্ন মুছে গেছে, বাস্তবের কঠিন চাপে জীবনের-রূপ-রস রঙ্ বদলে গেছে। সব হয়ে উঠেছে ধূসর।

এডেলট্রাউটকে বললাম 'তোমায় একটা ড্রিঙ্ক দিই?'

'আই উড্ লাভ টু।'

দুটো গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে নিয়ে এলাম লাউঞ্জে।

পেডারজিলের কথাগুলো বলে এডেলট্রাউট অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করছে।

বেশ খানিকটা ওয়াইন খাবার পর এডেলট্রাউট শুরু করলো ওর অতীত জীবনের কাহিনী।

'আমার এর পরের জীবনের কথা আরো দীর্ঘ। আরো করুণ। আরো বেশী করে মরমে মরেছি আমি।

পেডারজিলের কাছ থেকে আঘাত পাবার পর খুব সাবধান হয়ে চলতাম। প্রয়োজনের বাইরে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলতাম না। কোন ছেলের সামনে স্বাভাবিক হতে পারতাম না। চার্চে যেতাম। ইংরেজি শিখতে শুরু করলাম। এমনি করে কেটে গেলো আট মাস।

সাধারণ ভাবে যেমনি সবার সঙ্গে আলাপ হয় তেমনিভাবে আলাপ হয়েছিলো মাইকের সঙ্গে। ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে এলো। মাইকের প্রসংশা তখন সবার কাছে। ভারী সুন্দর ওর স্বভাব। কারো সঙ্গে বাড়াবাড়ি নেই। কাজ করে। পড়াশুনা করে। উইক এণ্ডে বাবা-মার কাছে চলে যায়। ওর স্বভাবের মতোই ওকে দেখতেও বেশ হ্যাণ্ডসাম। ছেলেরা বেশী সুন্দর হলে দেখবে মেয়েরা একটু ফ্লার্ট করতে চায়। বেশী হ্যাণ্ডসাম ছেলেদের বিয়ে করার অনেক বিপদ।

আমার কাছে মাইক তখন হাসপাতালের সহকর্মি ছাড়া আর কিছু নয়। রোজ দেখা হতো। খাবার টেবিলে না হয় ডিপার্টমেন্টে। কোনদিন বিশেষ চোখে ওকে দেখিনি। দেখা হলে কথা বলতাম শুধু সৌজন্যতা বজায় রাখার জন্যই।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসা হতো খাবার টেবিলে। আমার তাতে যোগ দেবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না।

মাইকের প্রতি সত্যিই উদাসিন ছিলাম।

বহুদিন পরে এডেলট্রাউট মাইকের কথা বলতে গিয়ে ওর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'একদিন রাতের শিফটে আমার আর মাইক দু'জনের একসঙ্গে ডিউটি পড়লো। তারপর থেকে বদলে গেলো আমার জীবনের অনেক কিছু।

রাত দশটার পর আমরা নার্সেস ডাইনিংরুমে খাওয়া-দাওয়ার পর সিগারেট খাচ্ছিলাম। বাইরে বেশ বৃষ্টি সুরু হয়েছে। ডিপার্টমেণ্টে রোগী সেদিন খুব কম। সবাইকে রাত্তিরে হট্ ড্রিঙ্কস দেওয়া হয়ে গেছে। আরামে ঘুমুচ্ছে ওরা। আমার সঙ্গের জুনিয়ার নার্স ডিপার্টমেণ্টে বসে লগ্ বুক লিখছে। আমি ভাবছিলাম একটু জিরিয়ে নিয়ে জুনিয়ারকে পরে ছেড়ে দেবো।

চুপ করে বসে থাকতে দেখে মাইক জিজ্ঞাসা করলো 'তুমি কেনিয়াক খাবে?'

বাইরে বৃষ্টি দেখে বেশ একটু রোমান্টিক বোধ করছিলাম। খুশি হয়েই বললাম 'ইফ ইউ প্লিজ পোর ওয়ান ফর মি।'

সুরু হলো কেনিয়াক খাওয়া। এখন ঠিক মনে নেই কটা কোনিয়াক খেয়েছিলাম। খানিক বাদে বেশ একটু টিপসি ফিল করছিলাম।

মাঝখানে একবার মাইককে বললাম অন্ ডিউটি রয়েছি। আর বেশী ড্রিঙ্ক করা ঠিক হবে না।

ড্রিঙ্ক বন্ধ হলো। গল্প হাসি তামাসা চললো তারপর। মনট অনেকদিন পরে হাল্কা লাগছিলো। এর মধ্যে একবার ওয়ার্ডটা ঘুরে এলাম। সব রোগী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ফিরে এলাম ডাইনিং রুমে। মনটা হাল্কা হয়ে উঠেছিল শুধু প্রাণ ভরে কথা বলার জন্য।

মনে হল কতদিন কথা বলিনি। ভেতরের চাপা বেদনা কোথায় সরে গেল সে মুহূর্তে। অনেক কথা বলে চললাম মাইকের সঙ্গে। ওর সঙ্গে বেশ সহজ হয়ে এসেছি তখন। সোজাসুজি ঠাট্টা করছিলাম।

'কটি মেয়ের চোখের ঘুম নষ্ট করেছো বলো তো ?'

মাইক গম্ভীর হয়ে উঠলো।

ঠাট্টা করতে গিয়ে ওকে আঘাত করেছি বোধ করে ওর কাছে ক্ষমা চাইবো ভাবছিলাম।

মাইক গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো 'যদি বলি তোমার জন্য আমারই ঘুম নষ্ট হয়েছে!'

এডেলট্রাউট হো হো করে হেসে উঠেছিল মাইকের কথা শুনে।

এডেলট্রাউট বলেছিলো 'আমার ভারী বয়ে গেছে'।

কথাটা কানে যেতেই কঠোরতার পরিমাণ বুঝে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলো এডেলট্রাউট 'এ হতেই পারে না'।

মাইক আরো কাছে এগিয়ে এলো। একেবারে এডেলট্রাউটের পাশে।

কাছে এসে মাইক আস্তে আস্তে বললো 'তোমার জন্য আমার ঘুম নষ্ট হয়েছে। এ কথাটা বলার জন্যেই অনেকদিন তোমাকে খুঁজেছি। সাহসে জোর করে তোমায় বলতে পারিনি'। 'অনুভব করছিলাম মাইকের গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ছে আমার ঘাড়ে'। আমার আবার হাসি পেলো ওর কথা শুনে। জোরে হাসতে গেলাম। মাইক গম্ভীর হয়ে গেলো। শুধু বললো।

'কি করছো!' 'রোগীরা ঘুমতে পারবে না এমনি করে জোরে হাসলে।' মাইকের কথায় ক্ষীণ একটা শাসনের সুর।

হাসি থামিয়ে এডেলট্রাউট জবাব দিলো 'তুমি টিপসি হয়েছ মাইক। যাও তোমার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বিশ্রাম করো'।

'তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না?' মাইকের গলায় অনুনয়ের সুর ঝরে পড়লেও এডেলট্রাউট শেষ চেষ্টা করছে ওর মনের সঙ্গে লড়াই করবার।

'ওর কথাগুলো আমাকে মুহূর্তের জন্য নাড়া দিলো।'

সোজা হয়ে বসে এডেলট্রাউট তাকালো মাইকের মুখের দিকে।

আমার সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারলাম মাইককে। আমার পোড়-খাওয়া মনের অভিজ্ঞতা দিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার সব রকম চেষ্টা করলাম। কোথাও দেখতে পেলাম না লুকোনো কিছু। মনে হলো ও আমার কাছে দিনের আলোর মতোই সত্য। ও লুকোচ্ছে না কিছু।

আমি মাইককে বিশ্বাস করলাম। তবু, তবু আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

এডেলট্রাউট মাইককে বললো 'জেসাস ক্রাইষ্টের নামে বলছো তুমি আমাকে চাও' ?

মাইক দু'হাত দিয়ে আমার দুটো হাতকে ধরে বললো 'সত্যি এডেলট্রাউট তোমার অজান্তে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তোমায় আমি কোনদিন বলিনি, বলার সুযোগ পাই নি। আমার জীবনের সব কিছু দিয়ে আমি 'তোমাকে চাই'।

তার পরের কয়েকটা মুহূর্ত আমার মাথার ভেতরটায় কি হয়েছিল আমি মনে করতে পারি নি। শুধু মনে আছে 'আমার দু হাতের মধ্যে রাখা মাইকের হাত দুটো ধরে ওকে আমার দিকে টেনে নিয়েছিলাম। নীবিড়ভাবে টেনেছিলাম। একেবারে আমার মুখের সামনে। মিশিয়ে দিয়েছিলাম আমার অনুভূতিকে মাইকের সঙ্গে। অনেকক্ষণ ধরে জড়িয়ে চুমু খেলাম মাইককে। ওকে আদর করতে গিয়ে কেঁদে ফেললাম'।

জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যা আগে থেকে ভাবা যায় না। আগে থেকে চিন্তা কয়া যায় না। মাইক এডেলট্রাউটের জীবনে তেমনি এক অধ্যায়। তেমনি এক শরতের মেঘ। অসীম নীল আকাশে ভেসে আসা এক টুকরো মেঘ।

এডেলট্রাউট বলে চলেছে। একটা অদ্ভুত মাদকতার মধ্যে কাটালাম রাতটা। ভোর বেলা চায়ের টেবিলে মাইকের দিকে

তাকিয়ে শুধু একবার মৃদু হেসেছিলাম। মাইক্ শান্ত। হাসির বদলে চোখটিপে আমায় ইশারা করলো।

দু রাত্তির নাইট করার পর অফ্ ডিউটির দিন মাইকের সঙ্গে বেরোলো এডেলট্রাউট। অনেক ঘুরাঘুরি করে ওরা ফিরে এলো মাইকের বাড়ীতে।

'মাইকের ছোট্ট ফ্ল্যাট। রান্না করলাম আমরা দু'জনে। খাওয়া-দাওয়া করে মাইকের বিছানায় বসে কোনিয়াক খাচ্ছিলাম। মাইকের চোখে ফুটে বেড়াচ্ছে একটা নিশ্চিন্ত ভাব।

এডেলট্রাউট ইশারা করলো মাইককে ওর পাশে বসবার জন্য।

কথা বলার মাঝে আরাম করতে করতে দু'জনে শুয়ে পড়েছিলাম মাইকের বিছানায়।

মাইককে জড়িয়ে ধরে এডেলট্রাউট জিজ্ঞাসা করলো 'কেন বলোনি এতদিন আমাকে ?'

'তুমি বলার মতো সুযোগ দাও নি।' মাইকের ছোট জবাব। মাইক থামে নি। কই আমাকে তো বললে না একটা কথা।'

'কি কথা ?'

'তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা ?'

কথায় জবাব দিতে পারিনি। অব্যক্ত আনন্দে আমার কান্না পাচ্ছিল। মাইকের বুকে মুখ গুঁজে ছিলাম।

মাইক আমার মুখটা তুলে নিল ওর হাতে। আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলো। আমার ঠোঁটের ওপর ওর ঠোঁট রাখল।

আমাকে আদরের পর আদর করে পাগল করে দিলো। আমার চিন্তায় মাইক ছাড়া আর কিছু নেই তখন। সব সঁপে দিলাম ওকে। মাইকের সমস্ত শরীর তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমার সারা শরীরে শিহরণ। আমি আর ভাবতে পারলাম না। শুধু মাইক আর আমি। আমার ভুত ভবিষ্যৎ সব ভুলে গেছি। সেই মুহূর্তটাই আমার কাছে দামী। সব চেয়ে বেশী দামী। মাইকের দেহের সঙ্গে আমি মিশে গেলাম।

ছু জনের কেউই ঘুমালাম না সে রাত্রিতে।

খুব ভোরে উঠে জামা কাপড় পরে কোয়ার্টারে এসে ইয়োহানাকে সব খুলে বললাম।

প্রথমটায় ইয়োহানা বিশ্বাস করেনি আমায়। গত রাত্তের সব কথা ভেঙে বলতে ইয়োহানা আমায় জড়িয়ে ধরলো।

সত্যি বিলিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। মাইকের কাছে আমার সমস্ত চেতনাকে জলাঞ্জলি দিলাম। আমার লজ্জা আমার শ্রদ্ধা সব দিলাম মাইককে।

দারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো তিনটে মাস। আমার জীবনের সব চেয়ে আনন্দমুখর ঐ তিনটে মাস। আমার জীবনের মণিকোঠার সবচেয়ে দামী সময়।

পেডারজিলের কাছে অতো বড়ো আঘাত পাবার পর ভাবতে পারতাম না আবার কাউকে ভালোবাসতে পারবো। আমায় কেউ ভালোবাসবে। আবার আমায় কেউ তুলে নেবে বুকে। মাইক ভুলিয়ে দিয়েছিলো আমার সব চিন্তা সব ভাবনাকে। ওকে আমার ভাবনা চিন্তা সব সঁপে দিয়ে আমি হাল্কা হয়ে উঠেছিলাম।

আমার ভালোবাসা মাইকের মধ্যে পেলো নতুন রূপ।

কোয়ার্টারে সবাই জানে মাইকের সঙ্গে আমি বেড়াচ্ছি। আমার কোর্স শেষ হয়ে গেলেই হবে। দারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আমার দিন কাটছিলো।

এডেলট্রাউটের ওয়াইন শেষ হয়ে গিয়েছে। ও নিজে থেকেই চাইলো। আরো খানিকটা ঢেলে দিলাম ওর গ্লাসে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফাটায় পা ছুটো লম্বা করে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলো।

এক মুখ ধোঁয়া উপরে ছুঁড়ে দিয়ে এডেলট্রাউট আবার বলতে শুরু করলো।

'আমার কপালে স্থখ বেশীদিন সয় না। মাইক সইলো না আমার ভাগ্যে। সব ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে গেলো। আজো

আমি ভাবি মাইকের সঙ্গে কেন এমন হলো। কোন জবাব পাই না। ভালোবাসার কোন ত্রুটি ছিলো না আমার। তবু কেন আমার স্বপ্ন ভেঙে গেলো কোনদিন বুঝতে পারবো না। আমরা যারটুনে বেশী বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার বেলা আমি শুধু বলবো আই এম আনফরচুনেট।'

এ ছাড়া আমার আর কোন সান্ত্বনা নেই।

আমার মনে হতো মাইক আমাকে জীবনের চেয়ে বেশী ভালোবাসতো। আমায় না দেখে একদিনও থাকতে পারতো না। কিন্তু একটা ব্যাপারে ঝগড়া হতে শুরু হলো ওর সঙ্গে।

আমার সেন্টিমেন্ট। ও বলতো আমি অতিরিক্ত সেন্টিমেন্টাল। মাঝে মাঝে ছোট ব্যাপার নিয়ে দু একদিন কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

মাইকের জন্য সবকিছু করতে পারতাম। চেষ্টা করতাম নিজেকে পাল্টাতে। কিন্তু আমার সেন্টিমেন্ট বদলাবার কোন উপায় ছিলো না। জ্ঞান হবার আগে মা-বাবাকে হারিয়েছি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শুধু শাসন আর ভয়ের মধ্যে ছোটবেলাটা কেটেছে। জীবনের শুরুতে ধাক্কা খেলাম পেডারজিলের কাছে। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার অভাবে ছোট কোন কিছু বিরাট করে আঘাত করে আমাকে। সমস্ত আবেগ আমার মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধেছে। অল্প কিছুতে অভিমান হতো। রেগে যেতাম। বিশ্বাস হারাতাম।

মাইকের আসতে দেরী হলে দারুণ রাগারাগি করতাম। কোন মেয়ে মাইকের সঙ্গে হেঁয়ালি করে কথা বললে ভয়ানক ঈর্ষা অনুভব করতাম।

অথচ ওকে ছাড়া আমার চলতো না। ঝগড়া করে ওরই বুকে কেঁদে পড়তাম।

একদিন ছোট্ট একটা ব্যাপারে মাইকের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হল। ও রেগে চলে গেল সে রাত্তিরে। দু'দিন পরে কিডিটস্-মুড়ে ওর সঙ্গে বিকেলে দেখা হবার কথা ছিলো।

সে দিনটায় দুপুর থেকে ইয়োহানার ভীষণ শরীর খারাপ করলো। বিকেল হয়ে এলো। ইয়োহানাকে একা ফেলে কিছুতেই বেরুতে পারলাম না। মাইককে টেলিফোনে খোঁজ করলাম ওর ডিপার্টমেন্টে। ওর সেদিন অফ্ ডিউটি। কোথাও খুঁজে পেলাম না মাইককে।

জীবনের ঘটনাগুলো যখন উৎরাইর পথে গড়াতে শুরু করে এমনি হয়। মাইকের সঙ্গে সেদিন আর যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। ভেবেছিলাম ও বুঝবে আমাকে। দেখা হলে সব বুঝিয়ে বলবো ওকে। মাইকের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিলো যে! ইয়োহানার পাশে পাশে রইলাম সারাটা সন্ধ্যে। সারারাত।

এর আগে ঝগড়া হলে মাইক এগিয়ে এসে আমাকে বোঝাতো। সান্ত্বনা দিতো।

কিন্তু পরের দিন মাইকের কাছ থেকে টেলিফোন এলো না। মাইক যে আমার ওপর সত্যি চটবে ভাবতেই পারিনি।

আমিই চেষ্টা করলাম ওকে টেলিফোন করবার। সারা সপ্তাহে একবারও যোগাযোগ করতে পারলাম না। শুনলাম ও ছুটি নিয়েছে।

প্রায় ষোল সতেরো দিন গুমরে গুমরে কাটালাম। অভিমানে কান্নায় বুক ভেসে গেলো।

মাইক আর খোঁজ করলো না আমায়। নিজে থেকে গায়ে পড়ে গেলাম ওর ফ্ল্যাটে। খোঁজ করলাম ওর বাড়ীতে। কোথাও নেই।

চার সপ্তাহ পরে ওর ফ্লাটে পেলাম ওকে। আমাকে দেখে আরো রেগে গেলো মাইক। দারুণ ঝগড়া করলাম আমরা দু'জনে। সান্ত্বনার জন্য এগিয়ে এলো না। আমাকে জড়াবার জন্য ওর হাত দুটো এগিয়ে দিলো না। ভাবতে পারিনি মাইক এমনিভাবে বদলে যাবে। একবারও তাকায় নি আমার দিকে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আমার তখন কথা বলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

বুঝতে পারলাম মাইক আর আমাকে চায় না।

লজ্জায়-ক্ষোভে-অপমানে কাঁদতে কাঁদতে চলে এলাম আমার কোয়ার্টারে। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। ঘুমুতে চেষ্টা করে ঘুমুতে পারলাম না। মনে হলো বহুদিন গির্জায় যাইনি। চলে এলাম কিভিটস্মুরের গির্জায়। অনেকক্ষণ অর্গেন শুনলাম। কি ছিলো জানিনা বাজনায়। সাহস পেলাম। বেঁচে থাকার একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম মনটা এবারে ভেতরের আমিকে খুঁজছে।

এতো বড়ো দুঃসংবাদটা বলতে পারলাম না ইয়োহানাকে। আমার লজ্জা ঢেকে রেখেছিলাম ইয়োহানার কাছ থেকে। আমার ব্যর্থতার আগুনে আমি নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছিলাম।

তার মাসখানেক বাদে শুনলাম মাইক চলে গেছে ব্রেমেনে। শেষ হয়ে গেলো আমাদের জীবনের ক'টা আনন্দ মুখর দিনের।

মাইককে হারিয়ে হাসপাতালটা যেন গিলে খেতো। আমি পারলাম না আর ওখানে থাকতে। চলে এলাম অকসেনসোলে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। বলে চলেছে এডেলট্রাউট ওর জীবনের সেই অল্প মধুর দিনগুলোর ইতিহাস।

অনেকটা ওয়াইন খাওয়া হয়ে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়া আর ওয়াইনের ঝাঁঝে চোখ দুটো জ্বলছিলো। নাকি কান্না পাচ্ছিল! বোঝার শক্তি সে মুহূর্তে ছিলো না। আমার ঝাপসা চোখ দেখে এডেলট্রাউট চমকে উঠেছিল।

কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম। ও কিছু নয়। মিনতির সুরে বলেছিলাম 'রাত আরো খানিকটা গল্পো করে সকালে চলে যেয়ো'।

এডেলট্রাউট সোফায় নড়ে চড়ে বললো। আমি মাটিতে বসে। মাথা এলিয়ে দিয়েছিলাম এডেলট্রাউটের কোলে। চুলের ভেতর ওর আঙুলগুলো বুলোতে বুলোতে বললো আমার জীবনে কিছুই গল্প নয়। গল্প হলে বেঁচে যেতাম। ভুলে যেতাম সব কিছু। কিন্তু সব যে বাস্তব। দিনের আলোর মতোই সত্যি।

এডেলট্রাউট বলে চলেছে 'তারপরের কাহিনী খুবই ছোট। এরপরে যা করেছি কিছুই আমাকে আর নাড়া দিতে পারে নি। জীবনে হু'হুটো ধাক্কা খেয়ে সহজ হবার চেষ্টা করছিলাম। সব কিছু ভোলবার চেষ্টা করছিলাম।

আবার নতুন করে সব কিছু গড়বার স্বপ্ন দেখলাম। হাসপাতাল ছেড়ে দেবার পর মাঝে মাঝে যেতাম ইয়োহানার কাছে। ওই ছিলো আমার একমাত্র সান্ত্বনা যাকে আমি সব কিছু বলে মনের গুমোটভাব থেকে রেহাই পেতাম। ইয়োহানাকে বলেছিলাম আর কোন ছেলের সঙ্গে মিশবো না।

সারাদিন খাটতাম। হাসপাতালে ডিউটির বাইরে বেশী কাজ করে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটাতাম। কাজের মাঝে ভুলে যেতাম নিজেকে। একলা থাকলেই কোথা থেকে চেপে ধরতো রাজ্যের সব ভাবনা। তাই কাজ দিয়ে ভুলে যাবার চেষ্ট করছিলাম অতীতকে।

কিন্তু যে মুহূর্তগুলোতে একা থেকেছি? বার বার মনে পড়েছে বিগত দিনগুলোকে। চেষ্টা করেও ভুলতে পারলাম কই!

ভুলতে আমি পারিনি। বরং নিজেই দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে জীবনকে করে তুললাম আরো জটিল।

ক্লান্ত সন্ধ্যায় কোয়ার্টারে ফিরে এসে বহুদিন অঝোরে কেঁদেছি। কতো দিন গেছে যখন আর থাকতে পারিনি। চলে এসেছি এলবে'র ধারে। আমার হু'চোখ ভরে দেখেছি আমার আশৈশবের সঙ্গী এলবেকে।

জীবনে অনেক কিছু পুরোনো হয়ে গেলো। পুরোনো হয় নি এলবে। এলবের জলের উচ্ছ্বাস আমার প্রাণকে করে তুলতো আরো উদ্বেলিত। তবু অনেকটা সান্ত্বনা পেতাম এলবের দিকে তাকিয়ে থেকে।'

প্রথম সন্ধ্যায় দেখা এলবের কথা আমার মনে পড়ে গেলো। আমিও ভালোবেসে ফেলেছি এলবেকে। ছোট ছোট ঢেউগুলো

উঠছে আর নামছে। চারদিকের আলোগুলো এসে পড়ছে ঢেউয়ের মাথায়। চিক্ চিক্ করে উঠছে ঢেউগুলো।

এসবের কথা ভাবতে ভাবতে চলে গিয়েছিলামসেই গঙ্গার ধারে। গঙ্গার পারে যেখানে আমি চিনতে শিখেছিলাম এ জগৎটাকে।

'ডিপি' এডেলট্রাউটের কথায় আমার চিন্তার জ্বালা টুটে গেলো।

'জানো ডিপি আমার শুধু মনে হতো এ পৃথিবীতে যদি আমায় সত্যিকারে কেউ ভালোবেসে থাকে তবে তা হলো এলবে। ওর দিকে তাকালে আমার সব দুঃখ সব ব্যথা নিমেষে কোথায় চলে যায়।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে এডেলট্রাউট আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'আজ তুমি আমি গল্প করে কাটাচ্ছি। ক'দিন পরে তুমি যখন চলে যাবে তুমিও ভুলে যাবে আমাকে।'

এডেলট্রাউটকে বাধা দিতে চেষ্টা করিনি। হয়তো ও যা বলেছে তাই ঠিক। কিম্বা ঠিক নয়। নিজের মনে নিজেও জানিনা। করতে চাই না কোন কিছুর মুল্যায়ন। জীবনের এই মুহূর্তটাই হয়তো সত্যি। কি করে বলবো কালকের কথা।

এডেলট্রাউট যদি ওর পরিণতি জানতো তবে হয়তো এতো দুঃখে ভেঙে পড়তো না।

প্রসঙ্গটা হারিয়ে যায় ভেবে এডেলট্রাউটকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কি হলো?'

'আরো জানতে চাও আমার বেদনার ইতিহাস?' একটা জীবন দিয়ে এতো দুঃখ সয়েছি তুমি ভাবতে পারবে না আমার হৃদয়ের ভেতরটা কাঠ হয়ে গেছে। আজ ভয় পাই কোন কিছুতে সাড়া দিতে।'

'তবু শুনবো তোমার সব কথা। তোমার জীবনে আনন্দ না নিয়ে আসতে পারলেও খানিকটা দুঃখ তো ভাগ করে নিতে পারি। এডেলট্রাউট কোথায় যেন একটা মিল পাচ্ছি। কোথায় যেন এক সুরে বাজছে একই রাগিনী। তাই আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে জানার।'

এতো ঘটনার প্রবাহ পেরিয়ে এ্যাডেলট্রাউট হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক। ওর মুখে কোন বিরক্তি নাই।

'বহু ঘটনা ঘটে গেলো তার দেড় বছরের মধ্যে। সেন্টিমেণ্ট আবেগ সবকিছুর বালাই ছাড়বার চেষ্টা করলাম। ভীষণ কঠোর হয়ে উঠলাম। আর কোন কিছু আমাকে স্পর্শ করতো না'।

এ্যাডেলট্রাউটের মুখে আর কোন অবসাদ নেই। ওকে দেখতে পাচ্ছি স্বচ্ছ। পরিষ্কার ওর দৃষ্টি। নির্বিকারভাবে ও বলে চলেছে।

এর পরে আর নিজেকে বাঁধবার চেষ্টা করিনি। মাইকের সঙ্গে আলাদা হবার পর ঠিক করেছিলাম আর কোন ছেলেকে আস্করা দেবো না। পরে ভেবে দেখলাম কি লাভ তাতে। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। রেগুলার ডান্সে যেতাম। প্রচুর মদ খেতাম। জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়েছিলাম। তখন আমার নেমে যাবার পালা। আর একবার গড়াতে সুরু করলে থামা দায়। ধাপে ধাপে পাতালের অন্ধকারে নেমে চলেছিলাম। কোন পিছু টান বোধ করিনি। এমনি করে আলাপ হলো ক্রিষ্টোফার নিকোলাস এমো, পিটার ড্রিক আর হারউইক-এর সঙ্গে। এরা আমার পাতালের সিঁড়ি। একটার পর একটা করে নেমে এসেছি। প্রত্যেকের সঙ্গে অনেক অনেক রাত কাটিয়েছি। কোন বিষাদ আর ক্লান্তি আমাকে ছুঁতে পারিনি। যে যেভাবে আমাকে চেয়েছে বিলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। এরা সবাই আমাকে…।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো এ্যাডেলট্রাউট।

বুঝতে পারলাম ওর ব্যথায় আবার আঘাত পড়েছে। চুপ করে রইলাম। ওকে শান্ত হতে সময় দেওয়া ছাড়া অন্য আর কিছু করার নেই।

ওর হাসির গমক শেষ না হতেই কান্নার রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলো। 'জানো ডিপি, এরা প্রত্যেকে আমায় বলেছে সেই এক কথা'।

কেউ এ্যাডেলট্রাউটের হাত ধরে বলেছে ওকে ভীষণ ভালোবাসে।

আবার কেউ গভীরভাবে চুমু খেতে খেতে বলেছে এডেলট্রাউটকে ছাড়া ওদের জীবনের আর একটা দিনও কাটবে না।

এডেলট্রাউট কথাগুলো বলছে। ওর দেহটা বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওটা কি হাসি? ওটা কি কান্না? না ওটা দুয়ের সংমিশ্রণ।

'আজ আমার ক্রিষ্টোফার নিকোলাস এমো পিটার ড্রিক আর হারউইকের কথাগুলো মনে পড়লে দারুণ হাসি পায়। ওরা আমাকে বোকা ভাবতো। আই ওয়াজ রিয়েলি এ ষ্টুপিড্।'

সব চাইতে অদ্ভুত কি জানো? প্রথম প্রথম ওদের আমি বিশ্বাস করতাম। মনের কোণে প্রতিবার একটা আসার আলো উঁকি মারতো। এইবার বুঝি অতীতকে ভুলে নতুন জীবন সুরু করতে পারবো।

যা চায় আমার বয়েসে একটি মেয়ে। স্বামী সংসার সব কিছুর কল্পনায় প্রতিবারে নিজেকে সঁপে দিয়েছি ওদের ইচ্ছের কাছে। কিনতে চেয়েছিলাম নিরাপত্তা। জীবনের সবটুকু লজ্জা সম্ভ্রমকে বিলিয়ে। আলেয়ার পেছনে আমার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ছুটেছি। শুধু ছুটে চলেছিলাম।

পুরোপুরি কান্নায় ভেঙে পড়লো এডেলট্রাউট। 'হিসেব কষতে গিয়ে দেখলাম শুধু পাওনাই রয়েছে। বলতে পারো কি পেয়েছি আমার সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে?'

সান্ত্বনার ভাষা আমার জানা নেই। এডেলট্রাউটের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম। তাই বলে একেবারে ভেঙে পড়লে জীবনে বাঁচবে কি নিয়ে'? মানুষ মরীচিকার পেছনে যায়। আবার তারই সহজাত বুদ্ধি তাকে বুঝিয়ে দেয় লাভ নেই মরিচিকার পেছনে ছুটে।

এডেলট্রাউটের নিজের সম্বন্ধে ঘৃণা ঝরে পড়লো ওর কথার সুরে। বেশ ভারী হয়ে এসেছে ওর গলা।

'শুধু দেহের তাগিদে ওরা আমায় নিয়ে খেলেছে। নিজেকে বিলিয়েছি। অগুনতি রাত ওদের বিছানায় কেটে গেছে। শুধু প্রতিদানে চেয়েছি একটু ভালোবাসা। প্রেম। স্নেহ। সামান্য দিয়েও আমায় কেউ গ্রহণ করুক। কিন্তু কেউ দিলোনা তার প্রতিদান। শূন্যতায় ভরে উঠলো আমার জীবন। প্রথমটায় ঘৃণা করতাম। ঘৃণা করতাম নিজেকে। নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতাম নিজের ওপর।

বার বার নিজেকে প্রশ্ন করতাম। যিনি সৃষ্টি করেছিলেন আমাকে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতাম, কেন এতো দুঃখ দিয়ে ভরে দিলেন আমার জীবনটাকে ? এতোটুকু ক্ষমা, একটু দয়ার উপযুক্ত হতে পারলাম না ? ঈশ্বরের দেবত্ব ( ? ) কি শুধু যারা ভালো কাজ করে তাদেরই জন্য ? যারা পাপী-তাপী তাদের কি গতি শুধু কালের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ?

সব কিছু হারিয়ে পৃথিবীতে আমার আর কিছুই রইলো না। শূন্যতা বেড়ে গেলো অদ্ভুতভাবে বদলে গেলো আমার জীবন। বাইরের সব কিছু থেকে আকর্ষণ হারিয়ে আকর্ষণ করতে সুরু করলাম নিজেকে।

নিজেকে ভালোবাসতে চেষ্টা করলাম। প্রথমটায় হতাশ হতাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আনন্দ পেতে সুরু করলাম।

আমার আনন্দের জগতে আমি একা। আগেও নিঃস্ব ছিলাম, এখন নিঃস্ব। তবে শুধু নিরাশা আর ঘৃণার মধ্যে বাঁচবো কেন ?'

আমার আত্ম-জিজ্ঞাসা থেকে জীবনকে বদলে দেবার অনুপ্রেরণা পেলাম।

ভাবছিলাম এডেলট্রাউটের জন্য। গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে আমার দু চোঁখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছিল।

এডেলট্রাউট অবাক হয়ে গেলো। বললো ডি পি, তুমি কাঁদছো আমার কথা শুনে ?

এডেলট্রাউট গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'আমার চোখে আরু জল আসে না। আর আমি এসব কথা ভেবে দুঃখ পাইনি। জীবনকে তারপর থেকে ভাসাতে চেষ্টা করেছি অন্য স্রোতে। আমার সে মনটা শেষ হয়ে গেছে।

এবার নতুন করে ভালোবাসতে শিখেছি। সুরু করেছি ভালোবাসতে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

এডেলট্রাউটের সমস্ত মুখটা প্রশান্তিতে ভরে আছে। ওর বেদনার হাসিতে ব্যথিত বোধ করবো কিম্বা ওর হাসিতে যোগ দেবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বেশী দিন নয়, মাত্র সাড়ে তিন বছর। একটার পর একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে। এডেলট্রাউটকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে দিয়েছে। নিজে খুঁজে পেয়েছে এগিয়ে যাবার উৎসাহ।

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল কান্না। এডেলট্রাউট কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। ওর ফর্সা মুখের রঙ গোলাপী হয়ে উঠেছে।

এডেলট্রাউট যখন কথা বললো মনে হলো ও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। বহু দূর থেকে ও কথা বলছে।

'এখন আর আমি কিছুর প্রত্যাশা করি না।'

ওর কথা শুনে মনে হোল এ হতাশা নয়। এ যেন নতুন করে জীবনকে উপলব্ধি।

'এর পরে কেউ আবার আমাকে মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবে ভাবো? এটাই স্বাভাবিক তাই নয় কি?'

প্রশ্নটা কার উদ্দেশ্যে বুঝতে পারলাম না। একি আত্ম-জিজ্ঞাসা!

'কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়…।' কথায় বাধা দিয়ে বললাম 'তেমনই লোক হলে সে নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝবে!'

এডেলট্রাউটের কথায় দৃঢ়তার সুর জেগে উঠলো। তেমনি কাউকে আর খুঁজি না। সে মনোবল আমার চলে গেছে। মানুষ যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বড়ো হয়ে ওঠে তার ছাপ জীবনে প্রতিফলিত

হবেই। পারবে না কেউ আমাকে নিয়ে তার আত্মীয়-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করতে। পারবে না আমাকে বিয়ে করে সংসারের মর্যাদা দিতে।'

এডেলট্রাউটের সঙ্গে মানুষের গুণাগুণ আর জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে সেদিন তর্ক করিনি। বহু দুঃখের পর ও খুঁজে পেয়েছে শান্তির পথ। যাতে শান্তি পায় সেটাই আজ ওর কাছে সব চাইতে মূল্যবান।

এডেলট্রাউট ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর আর্তদ্বন্দ্ব ওকে আজ পাগল করে তুলেছে।

'যিনি মানুষের দুঃখ দূর করতে গিয়ে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলেন, তিনিই দেখাবেন আমাকে পথ। মানুষের সীমিত ভালোবাসার আর বলি হতে চাই না জীবনে।'

তারপর থেকে প্রতিদিন যেতাম গির্জায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। মন ভরে উঠেছে আনন্দে। আজ কোন ক্লান্তি আমায় ছুঁতে পারে না। কোন অবসাদ আমায় ব্যথিত করে তোলে না। সীমাহীন ভালোবাসার মধ্যে আজ আমি হারিয়ে গেছি। আজ আমি সব পেয়েছি। মুখে মধুর হাসি নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ পুরুষের দিকে যখন আমি তাকাই আমার সব বল ফিরে আসে। উনিই পারেন আমাকে ভালোবাসতে। আমার আজ আর সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার কোন তাগিদ নেই।'

অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে এডেলট্রাউটের কথায়। ওর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এডেলট্রাউটের মুখে হাসির সঙ্গে বেদনা-মেশার সূত্রটা যেন ধরা পড়ে গেলো আমার কাছে।

'আর কি জানো' ?

তাকালাম এডেলট্রাউটের দিকে। ও নিজের শরীরের দিকে দেখিয়ে বললো 'এই দেহটার প্রতি আমার আর কোন শ্রদ্ধা নেই। এর সব মাধুর্য শেষ হয়ে গেছে। নিজের দেহ সম্বন্ধে যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ, আমার তা হারিয়ে গেছে। মরতে ভয় পাই। তাই

দেহটাকে শেষ করে দিতে পারিনি। শুধু যখনই একলা ঘরে নিজের দিকে তাকাই একটা বেদনা আমাকে বড় কাতর করে তোলে কিছুতেই জয় করতে পারিনি···। কথা শেষ হবার আগেই কান্নায় ওর স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। হাটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো। ভাবলাম একবার সান্ত্বনা দিই। কিন্তু আজ যখন ও নিজের সান্ত্বনা নিজে খুঁজে পাবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, শুধু কথায় ওকে শান্ত করা যাবে না। ওর অন্তর্দ্বন্দ্ব ওকে দগ্ধ করে তুলেছে। নিষ্কৃতি চাইছে তবু নিষ্কৃতি কই! পালিয়ে বাঁচা যায় না। নিজের কাছে নিজে কতোদূর পালাবে এডেলট্রাউট?

হাটু থেকে মুখটা তুলতে দেখতে পেলাম ওর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তখনো সমানে গড়িয়ে যাচ্ছে জল। ছোট্ট শিশুর মতো মুখ করে কাঁদতে কাঁদতে এডেলট্রাউট বললো 'আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার আশীর্বাদরূপে যে সন্তান জন্ম নেয় তার থেকে। আমার বুক তেমনি খালি রয়ে গেলো। কোনদিনই আর তা পূর্ণ হবে না ফুটফুটে সন্তানের কলকাকলিতে। কেউ ডাকবে না আমাকে মা বলে। আমিও কোনদিন ডাকতে পারিনি মা বলে। অনেক অনেক সাধ ছিলো মা হবার। কিছুতেই অনুভব করতে পারলাম না মাতৃত্বের স্বাদ। আমার সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। শুধু পারি নি সেই মা হবার কাঙাল মনটাকে জয় করতে'।

মনের কামনা-বেদনার রূপ নিয়ে বাইরে প্রকাশ পেলো। কথাগুলো বলে, হালকা বোধ করছিল এডেলট্রাউট।

নিস্তব্ধ শীতের রাত, সবাই ঘুমুচ্ছে। বাইরে তখন সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির চেয়ে হাওয়া বেশী। শুকনো গাছগুলোতে হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছে। পাতা নেই তাই খাড়া থাকলেও প্রতিক্রিয়া নেই।

মনে হলো অনেক অনেক যুগ পেরিয়ে চলে এলাম। হাজার

মানুষ। হাজারও তার কামনা। তবু একটা কাঙাল মনের রুদ্ধশ্বাস আজ নির্মম করে তুলেছে সমস্ত পরিবেশটাকে। ভাবছিলাম এডেলট্রাউটের কথা।

নিজেকে আবার নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছে এডেলট্রাউট।

আর দুঃখ করবো না। কান্না আমার সমস্ত মনটাকে দুর্বল করে দেয়। সব কিছু থেকে নিজেকে শাসন করেছি। শুধু নিজের পেটে সন্তান ধরতে পারিনি তাই এতো দুঃখ। মাঝে মাঝে ভাবি আমার ঈশ্বর আমাকে সমস্ত বিশ্বজোড়া সন্তানের মা করেছেন। সারা বিশ্বে আমার সন্তান।

এখন সিনিয়ার নার্স হয়ে গেছি। অনেক অনেক মার্ক মাইনে পাচ্ছি। তার অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি। বিলিয়ে দিচ্ছি সারা পৃথিবীর অনাহার ক্লিষ্টদের সাহায্য ভাণ্ডারে।

এশিয়ায় আফ্রিকায় আর লাতিন আমেরিকার নানা দেশে রোজ বহু শিশু না খেয়ে থাকে। আমার রোজগারের অর্থে তাদের সামান্যতম সাহায্য হলেও আমার মা হবার সাধ মিটবে। এদের মধ্যেই মেটাবো আমার মাতৃত্বের ক্ষুধা।

নিজের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছি। আর ভাবি না। আমার ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়েছি বিশ্বপিতার কাছে।

হাসপাতালের কাজও ছেড়ে দেবো। গির্জার অর্গান বাজানো শিখেছি। ডিপ্লোমা পেয়ে গেলেই হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দেবো।

কথার জোর টেনে বললাম 'হাসপাতালের কাজের মধ্যে দিয়েও তোমার সেবা হচ্ছে। তবে কাজ ছাড়বে কেন'?

হাসপাতালে থাকলে পুরোনো কথা বেশী মনে পড়ে। মনকে আর শান্ত করতে পারি না। হাসপাতালের কাজ ছেড়ে কাজ নেবো গির্জাতে। অর্গেন বাজানোর কাজ করবো। কথা সব ঠিক হয়ে আছে।

অনেককে শোনাতে পারবো দুঃখজয়ের গান। আমার বাজনার

মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে ঢেলে দেবো এগিয়ে যাবার সাহস। গির্জায় শান্তিলাভ করতে আমার মতো অনেকে যায়। তাদের শোনালে তারা শান্তি পাবে। পাবে জীবনে নতুন বল। নতুন শক্তি। যীশুর করুণা আর ভালোবাসা নিয়ে তারা আবার ফিরে যাবে প্রতিদিনের জীবনে।

অন্তত: যদি একজনও প্রেরণা পায় অর্গান শুনে, সব চাইতে বেশী আনন্দ হবে আমার। তারা ভালোবাসুক মানুষকে। ভালোবাসুক প্রতিবেশীকে। হয়তো কোনদিন তাদের অন্তরে জাগবে সত্যিকারের প্রেম। মানুষের ঘৃণা আর পশুর ভাব দূর করতে আমার জীবন সঁপে দিয়েছি।

'অর্গানের সুরে সুরে ঢেলে দেবো আমার অন্তরের বেদনা। আমার ভালোবাসা। আমার আকুতি। আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।'

এডেলট্রাউট আমার চোখে ওর চোখ রেখে বললো 'প্রচুর আনন্দ পাবো তাতে। নাই বা পেলাম ঘর বাঁধার স্বাদ। বেশ তো আছি একা একা। কারো সঙ্গে যেমন সুখের শয্যা নেই তেমনি নেই অভিমানের পালা'।

স্বাভাবিকভাবে এডেলট্রাউট বলে চললো কদিন বাদে আমি চলে যাবো গির্জার কাজে। 'হাজার হাজার লোক আসবে নানা আঘাত নিয়ে। কেউ আসবে রোগে শোকে দগ্ধ হয়ে। পাপী আসবে অনুতপ্ত হয়ে। আমার দশ আঙ্গুলে যতোটা সম্ভব সুর ঢেলে দেবো। তারা আবার ফিরে যাবে সহজ জীবনে। পাবে মনে জোর। অর্গানের তালে তালে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খৃষ্টের বন্দনা গাইবো। আমার যীশুর করুণা ছড়িয়ে পড়বে সবার প্রাণে প্রাণে।'

নিজের আত্ম বিশ্লেষণে বিভোর হয়ে উঠেছে এডেলট্রাউট। 'জানোতো, যারা পৃথিবীকে আর মানুষকে ভালোবাসে তাদের অনেক কষ্ট সইতে হয়। অনেক ত্যাগ করতে হয় তাদের। তা নইলে ভালোবাসা কুড়োবে কি করে?'

নিজের প্রশ্নে নিজেই জবাব দিলো এডেলট্রাউট্।

'কিছু না দিয়েই চাইছিলাম প্রেম। চাইছিলাম ভালোবাসা। তাইতো আমার দু হাত রয়ে গেলো শূন্য। দুঃখ যা পেয়েছি আজ তা মাথায় তুলে নিয়েছি। সে দুঃখই আমাকে ভালোবাসার পথ দেখালো। যখনই অনুতপ্ত হলাম সব ক্ষমা করলেন যীশু। যীশুর এতো দয়া তাইতো তাঁর কাজে নিয়োগ করতে পারলাম নিজেকে।

রাত ভোর হয়ে এলো। এডেলট্রাউট তখনো বসে আছে সোফাটায়। অনেকক্ষণ ওর আর কোন সাড়া শব্দ নেই। ও সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করে হঠাৎ এসে থমকে গেছে। নিঃশব্দ গভীর এডেলট্রাউটের চাউনি। সে চোখে বেদনা আর আনন্দ দুই এসে মিশেছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ব্যথিত মানুষের হাহাকার। অমানুষিকতার চাকার তলায় মিশে গেছে সূক্ষ্ম অনুভূতি। মর্যাদা ম্লান হারিয়ে আজ এডেলট্রাউট আত্মমুখি।

রুডলফ ষ্টাইনার স্কুলের অধ্যাপকের কথাগুলো মনে পড়েছে। 'বিশ্বে চলেছে যন্ত্রের হুঙ্কার। বেড়েছে জীবনযাত্রার মান। বুক ফুলিয়ে গলা বাজিয়ে সবাই বলে চলেছে মানুষ আর না খেয়ে মরবে না। অনাহারে ধ্বংস হয়ে যাবে না। সত্যি কথা মানুষ হয়তো দু'বেলা দু'মুঠোর সংস্থান করতে পারবে। মিটবে কি তাতে অভাব?'

ঘরের সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিলো। কি বলতে চায় অধ্যাপক! প্রশ্ন করছিলেন তিনি 'তবে আর আমাদের দুঃখ কিসের?' বলে চলেছেন মিঃ বুকহার্ষ্ট, মানুষের অনুভূতি, সেটাকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি। মনের ভেতর থেকে সহজ আর সরলতাকে দূরে ঠেলে জীবনকে করে তুলেছি কঠোর নির্মম। অনুভূতিগুলো যন্ত্রের তলায় পড়ে আর্তনাদ করছে অনুভূতিশীল মানুষের মৃত্যু।'

মিঃ বুকহার্ষ্ট মানুষকে সত্যিকারে বাঁচতে শেখাচ্ছেন। জীবনটা শুধুই কলকব্জা নয়। এতে আবেগ আছে। আছে অনুভূতি।

এতে আছে মানুষের বিভিন্ন ভূমিকা। একই মানুষ কখনো সন্তানের রূপে। কখনো পিতারূপে। আবার কখনো স্বামীরূপে। সেই সচেতন মানুষটাকে জাগাবার প্রচেষ্টা।

সারারাত জেগে সকালের দিকে ঘুম পাচ্ছিল। সবাই জাগার আগে এডেলট্রাউট চলে গেছে।

যাবার আগে এডেলট্রাউট বলছিল 'দুঃখের দিনের কথাগুলো মনের মতো কাউকে বলতে পারলে বুকটা হালকা হয়ে যায়। দুঃখ পাওয়াটা আমার জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার। না পাওয়াটাকে বিলাসিতা ভাবি'।

রাত্রি জাগার কোন ক্লান্তি নেই ওর মুখে। এতো কথা এতো কান্না কিছুই ওকে আজ আর ছুঁতে পারছে না। বেদনা আর হাসি দুই গিয়ে জীবনের নতুন সিঁড়িতে পা দিয়েছে এডেলট্রাউট।

আমার হাতে একটু মৃদুচাপ দিয়ে ভোরের কুয়াশার মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মিশে গেলো এডেলট্রাউট।

সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যেবেলা নদীর টানে এলবের পাড়ে গিয়ে বসেছিলাম।

এলবের পারাপারের লঞ্চ বন্ধ হয়ে গেছে। জোর ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জলের স্পর্শ। দূর থেকে একটা জাহাজ শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে উত্তর সমুদ্রের দিকে। হ্যামবুর্গ বন্দরের নোঙ্গর গুটিয়ে চলে যাচ্ছে অকূল সমুদ্রে। অবিরাম ভেসে চলেছে বন্দর থেকে বন্দরে। জলের যাযাবর।

সপ্তাহের শেষে আমিও চলে যাবো। অজানা আরেকটা নতুন পরিস্থিতি। সবাই চলে যাবে। বয়ে যাবে এলবে। দিন রাত্রি ঝড় তুষার যুদ্ধ আর শান্তি সব কিছুকে পেরিয়ে বয়ে চলেছে এলবে।

এডেলট্রাউট বলে এলবের দিকে তাকালে পুরোনো ব্যথা জানা। আবার কেউ বলে এলবে আমার পরাণ জুড়ায়।

কুয়াশায় ঢেকে আসছিল তুষার। উঠে পড়লাম নদীর পাড় থেকে।